Durer Sojon by Abdur Shukur Khan

For More Books Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

উপন্যাস www.MurchOna.com

দূরের স্বজন

আবদুস শুকুর খান

দরজা খুলতেই বাণী দেখল তুহিন দাঁড়িয়ে আছে। তার সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা। রৌদ্র-রাঙা মুখ। রক্তাভ। মাথার চুল বিন্যস্ত। চোখের চশমা খুলে রুমালে মুছছে। মুখ গম্ভীর।

তুহিনকে দেখে বাণীর সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। একটা রাগ শরীর বেয়ে শুঁয়োপোকার মতো হিল হিল করে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়তে চাইল; তুহিনের আপাদমস্তক দেখে আত্মস্ত হয়ে বলল– কি ব্যাপার তুহিন?

তুহিন নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে থাকে। কথা বলে না। তুহিনের নীরবতা বাণীকে আরও অসহিষ্ণু করে। তার কথা না বলা, গম্ভীর থাকা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সবই যেন কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে বুকে। বিব্রত বাণী। ঘরে ফিরে সোফায় বসে, আবার উঠে পাখা চালায়। হাতের কাছে 'সেতু' পত্রিকা উলটে-পালটে দেখতে থাকে।

ঘরের পশ্চিমের জানালায় নীরা বসেছিল। তুহিনের ঘরে ঢোকা, জুতো খোলা, কথার উত্তর না দেয়া সবই সে দেখছিল। বাণীর অসহিষ্ণুতা বুঝতে পেরে তার কাছে এসে দাঁড়াল। আলতো কাঁধ ছুঁয়ে যেন আশ্বস্ত হতে বলল। দু-জনে চুপচাপ। এ ওর মুখের দিকে দেখল শুধু। তারপর দুজনেই চোখ রাখল খোলা দরজার দিকে।

বাইরে দরজা বন্ধ করে, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল তুহিন। হাতের ব্যাগ রাখতে রাখতে আড়চোখে বাণীকে দেখল। নীরার প্রশ্নাতীত বিস্ময় কিংবা বাণীর কপট রাগ কোন কিছুই স্পর্শ করল না তাকে। বাণী যে রেগে আছে এবং ঘরের ভেতর বিষাক্ত হাওয়া বইছে তা সে ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছে। তবু ঘৃণার চোখে বাণীর দিকে তাকাল সে। বাঁকা ঠোঁটে ক্রুর হাসি। হাসিটা কিন্তু বাণীর চোখে এড়াল না।

নীরা ও তুহিন দুজনেই কোলে পিঠের ভাইবোন। নীরা উৎসুক, দাদার দিকে চেয়ে থাকে।

তুহিন জামা-কাপড় ছেড়ে বসল বাণীর মুখোমুখি। বাণী ঘামতে থাকে, তবুও মাতৃত্বের অপরিসীম জোরে জিজ্ঞেস করে– কী হ'ল কথা বলছ না যে?

– কি বলব?

– এত কৈফিয়ত তোমাকে দিতে হবে নাকি?

– দরকার হলে দিতে হবে বৈকি?

– না, কৈফিয়ত আর কাউকে দেব না। চিৎকার করে তুহিন। পাথর হয়ে যেতে যেতে বাণী দুহাতে আঁকড়ে ধরে সামনের টেবিল। টেবিলে মাথা রাখে। সারাশরীর আলগা হয়ে যায়। একটা অস্পষ্ট চিৎকার তার মুখে আটকে যায়। রাগে গোঙাতে থাকে সে। তারপর ধীরে ধীরে টেবিল থেকে মুখ তোলে। কঠিন দৃষ্টিতে তুহিনের দিকে চায়। চেয়ে থাকে। চোখের পলক পড়ে না।

নীরবতা ভেঙে নীরা বলে– দাদা তোর স্কুল ছুটি হয়েছে এগারটায়, তুই এই চারটে পর্যন্ত কোথায় ছিলি?

– যেখানে থাকি না কেন? তাতে তোর কী?

– দাদা, বাপীন ফিরে এলে সব বলে দেব।

– যা, যা বলগে যা।

নীরা চুপ করে যায়। তুহিনের কথার রুক্ষতায় বাণী বা নীরা দুজনেই চমকে ওঠে।

তুহিন হাতের মধ্যে একটুকরো কাগজ দলা পাকাতে পাকাতে বলে– কৈফিয়ত, কৈফিয়ত চাইছে আমার কাছে! নীরা আমি যদি কৈফিয়ত চাই ওর কাছে, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে? তবুও যদি নিজের মা হতো! পেটে তো ধরেনি, সন্তানদের স্বাদ বুঝবে কী করে!

বাণীর সমগ্র পৃথিবী কেঁপে ওঠে। পায়ের তলায় মাটি থর থর কাঁপতে থাকে। মাথা ঘুরে যায়। নেশাগ্রস্তের মতো সামনের দেয়াল ধরে কোন রকমে নিজেকে সামলে নেয়। নীরব কঠিন দৃষ্টি দিয়ে দেখে তুহিনকে।

নীরা এসে বাণীর হাত ধরে। বাণী সরিয়ে দেয়। নীরা চমকায়, আহত হয়ে সরে যায়। বাণীর এ ঘর ছেড়ে যাবার ইচ্ছা করছিল কিন্তু গেল না, একটা বোঝাপড়ার জেদ তাকে আরও শক্ত করে তুলল।

দীর্ঘদিন রাজনৈতিক সংগ্রাম করেছে বাণী। একাত্তরের অস্থির দিনের উত্তাল তরঙ্গ সে নিজের চোখে দেখেছে। ভয়, মান, অপমান, লজ্জা, খুন, রক্ত তার বহু চেনা। তার চোখের সামনে তরতাজা প্রাণ পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে, তাদের নিজের হাতে সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছে। কয়েকজন মারাও গেছে। এতটুকু বিচলিত হয়নি, সেই সময়, সেই অস্থির আগুনের স্রোত দু-হাতে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পেরেছে আর আজ এই পুঁচকে ছেলেটার কাছে হার মানবে, এমন নারী তৈড়ি হয়নি তার। জীবনের কোথাও কোনদিন হারেনি, আজও সে হারবে না। কোন মতেই না।

মনে মনে শক্ত হয় বাণী। রাজনৈতিক জীবনে কত জটিল চরিত্রের সঙ্গে তার চেনা-জানা হয়েছে। কত পরাক্রম ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে অথচ পনের-ষোল বছরের ছেলেকে নিজের করতে পারবে না, তাই কখনও হয়। বাণীর চোখ ফেটে জল গড়াতে চায়। বাণী প্রতিরোধ করে। চোখের গভীর থেকে তীক্ষ্ণ আলোর রেখা মুছে স্নেহের জ্যোৎস্না নামে। তবুও অলক্ষ্যে দু-ফোঁটা চোখের জল টেবিলের ওপর টলমল করে।

মায়ের প্রসঙ্গ আসতেই নীরা কেমন যেন চুপসে যায়। বাণীর পাশেই মাথা নিচু করে থাকে। বাণী নীরব অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখে নীরাকে। নীরার মুখ ফ্যাকাসে। যেন অনেক দূরে স্বপ্ন রাজ্যের এক অনুকূল পরিবেশে বসে আছে সে। মায়ের প্রসঙ্গে সেও কী তবে বিব্রত?

বাণী বুকের ভিতরে তীব্র জ্বালা অনুভব করে।

বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে গ্রীষ্মের দুপুর। জানালা দিয়ে রোদের ঝাঁঝ আসছে বলে, জানালা বন্ধ করে দেয়। জানালার বাইরে আইসক্রিমওয়ালার ডাক। রাস্তা দিয়ে দমকল ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটে যায়। কাছে-পিঠে কোথাও আগুন লেগেছে।

তিনটে প্রাণী আলাদা-আলাদা মূর্তি হয়ে বসে থাকে। একজনের চোখে মুখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। আর একজন জলপরী হয়ে জলের গভীর অতলে স্মৃতির মণিমুক্তোর ভারে ডুবে যেতে থাকে। অন্যজন উদভ্রান্ত, উদাসীন। সত্য-অসত্যের দোলাচলে সন্দিগ্ধ। আত্মময়।

পরিবেশ হাল্কা করার জন্য বাণী উঠে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল আর গ্লাস বের করে ছেলের সামনে রাখে। সকালে দুধের পায়েস করেছিল, তা নিয়ে আসে।

– আমি খাবো না, খিদে নেই। তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তুহিনের।

বাণী কিছু বলে না। জোরও করে না। বাণী জানে তুহিনের রাগ হলে এমন আচরণ করে। রাগ কমলে আবার স্বাভাবিক, সবই মানিয়ে নেবে। টেবিলে রাখা ঠাণ্ডা জলের গ্লাসের বাইরে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বাণী লক্ষ্য করল তুহিনকে। আর অদ্ভুত রকমের মায়ায় তার বুক ভরে যায়। সে মাতৃত্ব দিয়ে ছেলের ক্ষত ছুঁতে চায়। স্নেহময় চোখে তার দিকে চেয়ে থাকে।

বাণী জানত, তাকে একদিন না একদিন এমন কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবেই। তুহিন কৈফিয়ত

চেয়েছে? সে কৈফিয়ত কী তা এখনও বলেনি। বাণী জানে, সে তার কাছে কী কৈফিয়ত চাইবে বা চাইতে পারে। সে উঠে তুহিনের পিঠের কাছে দাঁড়ায়। মাথায় হাত রাখে। অবিন্যস্ত চুলে আঙুল চালিয়ে স্নেহের স্পর্শ দেয়। তুহিন মাথা সরায় না বা সরানোর চেষ্টা করে না। বাণী ধীরে ধীরে তার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরে। খুবই ক্লান্ত স্বরে বলে– তোমাদের আমি পেটে ধরিনি, সত্যি। তবুও আমি তোমাদের মা, তোমাদের বাবা আমাকে বিয়ে করে এনেছেন। কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে তা তোমাদের বাবাকে জিজ্ঞেস করো।

– বাবার খবর তুমিই ভালই বোঝ। তেতে ওঠে তুহিন।

বাণী সতর্ক। ধৈর্য হারায় না।

– ঠিক আছে এগুলো খেয়ে নাও। তারপর তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব। তোমার বাবাকে তোমরা যতটুকু জানো, তার চেয়ে বেশি আমিই বা কতটুকু জানি? তোমরা যখন খুব ছোট তখন আমি এসেছি এ-বাড়িতে। তোমাদের আগের জীবন আমি কিছুই জানি না।

– থাক, খুব হয়েছে।

ক'দিন ধরেই বাণী লক্ষ্য করছিল, তুহিন কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। বয়ঃসন্ধিকালে এমন পরিবর্তন আসে। কিন্তু এ পরিবর্তন সম্পূর্ণ অন্যরকম। সারাক্ষণ আনমনা। মধ্যরাতে জানালায় সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে দেখেছে তুহিন ক্লাসের বই ফেলে নাটক, নভেল, বিশেষ করে অপরাধমূলক বইপত্তর বেশি পড়ে। সাতটা প্রশ্ন করলে একটার উত্তর দেয়। যেন সে খুবই অপরাধী ওর কাছে। সব রাগ যেন তারই ওপর।

তুহিন স্কুলে চলে গেলে বাণী ওর বই পত্তর, স্কুল ব্যাগ ঘেঁটে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে– অসংখ্য ছেলে-মেয়ের ঠিকানা ও ছবি। এরকমই একটা মেয়ের ছবির নিচে লেখা– সুইট। আই লাভ ইউ। মেয়েটাকে তার খুব চেনা মনে হলো।

বাণী স্কুলে পড়ায়। পড়ায় বলেই এই বয়সে ছেলে মেয়েদের আচার-আচরণ তার নখদর্পণে। সে জানে, ক্লাস এইটে-নাইনে পড়া ছেলে-মেয়েরা বয়সের তুলনায় পাকা। বয়ঃসন্ধিতে ছেলে-মেয়েরা প্রেম ভালবাসায় জড়িয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। জীবনধর্ম বন্ধ করার মতো কোন পথ নেই। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। সংবাদপত্রে 'হেরোইন' মাদকদ্রব্য, নেশাগ্রস্ত ছেলে-মেয়েদের ঘটনা পড়ে সন্দেহের তির ঘুম কেড়ে নিয়েছে তার।

তবে কী তুহিন লুকিয়ে লুকিয়ে ওসব খেতে শিখেছে। কাগজে পড়েছে– নেশার বড়িতে আসক্ত হলে, ছেলে-মেয়ে এমন খিটমিটে স্বভাবের হয়।

দিবাকরকে ছেলের বর্তমান আচরণ সম্পর্কে সব কিছুই জানিয়েছে বাণী। দিবাকর গুরুত্ব দেয়নি। উল্টে তাকে শাসন করে, বলছে– ছেলের সম্পর্কে তুমি অযথা ভয় পাচ্ছো। ও ভাল ছেলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও এমন কিছু করবে না, যাতে আমার মান-সম্মান নষ্ট হয়। স্বামীর কথা শুনে বাণী মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছে– তাই যেন হয়।

দিবাকর ব্যবসায়িক কাজে কলকাতার বাইরে। ছেলে-মেয়ে, ঘর-সংসার ব্যবসা, স্কুল সবই তাকে দেখতে হয়।

তুহিনের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সে ভাবে, তুহিন যতই জেদ বা রাগ দেখাক না কেন, দিবাকর ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। বড় ভরসা করে দিবাকর তাকে এ-বাড়িতে এনে দুই অসহায় ছেলে-মেয়েকে তার হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই বিশ্বাসের মর্যাদা তো দিতেই হয়।

বাণী যেন পাথর। তুহিনের সমস্ত অপমান নীরবে সহ্য করে চলেছে। দিবাকরের ফিরতে এখনও দু-মাস।

তুহিনকে রাগতে দেখে কষ্টের হাসি হাসে বাণী। দুঃখের অজস্র পোকা তার বুকের ভিতর ঝাঁঝরা করে দেয়। তির বিদ্ধ পাখির মতো সে কাতর কণ্ঠে বলে– আচ্ছা, তোমাদের মা নেই। আমিও তোমাদের পেটে ধরেনি, সবই ঠিক। কিন্তু তোমরা জ্ঞান হওয়া অবধি আমাকে মা বলে জানো! আমারই কোলে পিঠে মানুষ হয়েছ।

বলতে পারো কোথায় কি কার্পণ্য করেছি? তোমরা ছাড়া আমার কেউ নেই– এর চেয়ে বড় সত্য আর কী আছে।

– জানি, জানি, সব জানি।

– তবে এমন ব্যবহার করছ কেন?

– তবুও নিজের মায়ের সঙ্গে তোমার অনেক তফাৎ! ব্যঙ্গের হাসি হাসে তুহিন।

বাণী নিজেকে গুটিয়ে নিতে গিয়েও পারে না। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে

তফাৎ কি দেখলে বলতো? তোমার মা না হয় তাঁর বুকের দুধ খাইয়েছেন ....।

– থাক, থাক খুব হয়েছে।

– অত রাগ করলে প্রশ্নের উত্তর পাবে কী করে বাবা। আমি কথা দিচ্ছি এখান থেকে যাবার আগে সবাইকে সব উত্তর দিয়ে যাবো।

– আমি কাউকে কোথাও যেতে বলিনি। শুধু সত্যি কথাটা বলতে এত ভয়ও পাও কেন?

– সত্যি! কিসের সত্যি?

– কেন তোমার জন্য বাপীন আমার মাকে ডিভোর্স দেয়নি? এ কথা অস্বীকার করতে পারো? বলো?

– তুহিন। বাণী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, কেঁদে ফেলল।

বিস্মিত নীরা। সেও অস্পষ্ট স্বরে বলল– দাদা কী যা তা বলছিস।

– হ্যাঁ নীরা, তুই জানিস না, এই ডাইনির জন্য বাপীন আমাদের মাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা মাতৃহীন হয়েছি। মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের মা থেকেও নেই। কে জানে, কোন অজ পাড়া গাঁয়ে কার বাড়িতে ভিখারিণীর মতো ঠোক্কর খেতে খেতে বেঁচে আছে। বেঁচে আছে কী মরে গেছে তাই বা কে জানে। আহ্ নীরা এ যে কী জ্বালা, তুই বুঝবি না। এ আমি সহ্য করতে পারি না। এঁকে মা বলতে ঘৃণা হয়।

বাণী আর সহ্য করতে পারল না। বিছানার আশ্রয় নিল। এত অপমান সহ্য করা যায় না ঈশ্বর।

তুহিন অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরময় পায়চারি করে। নীরার চোখের দিকে চেয়ে বলে– এ বাড়িতে আমার থাকতে ইচ্ছে করে না, একদিনও এখানে থাকতে ভালো লাগে না।

নীরা দাঁড়ায় তুহিনের মুখোমুখি। বলে– দাদা এখন তুই চুপ কর, বাপীন ফিরে আসুক আমি জিজ্ঞেস করব, মা এমন কি অপরাধ করেছিল যে তাঁকে তাড়িয়েছেন। দরকার হল বাপীনের হাতে পায়ে ধরে তাঁকে ফিরিয়ে আনবো।

নীরার কথায় তুহিন চুপ করে, জল খায়, পায়েস হাতে নিয়ে একবার বাণীর দিকে দেখে, একটা কষ্ট তাকে আহত করে। মুখে গভীর সংশয় নিয়ে আনমনা হয় পায়েস খেতে বসে।

তুহিন শান্ত হলে পাশের ঘরে এসে বাণী একা একা কাঁদে।

নীরা চুপচাপ। সংশয়ে দোলে সে। এর জন্যই বাপীন মাকে ডিভোর্স করেছেন। ঘরের মধ্যে দুপুরে তাপ কমে গিয়ে শীতল অন্ধকার। পৃথিবীর ওপর কেউ যেন ধূসর চাদর ঢেকে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। জানালা খোলে নীরা। দূর আকাশে এক ঝাঁক পাখি উড়তে দেখে। নীরা অবাক হয়। এই আকাশ, এই পাখি, এই পৃথিবী, মানুষ, পশু, কীট-পতঙ্গের মধ্যে কী নিবিড় সম্পর্ক! কী বন্ধন! ভালোবাসার টান! নীরা হারিয়ে যায়। আকাশ-পাখির মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পায় না। পাখি যতক্ষণ আকাশে ডানা মেলে ততক্ষণ আকাশের সৌন্দর্য। পাখি-শূন্য আকাশ শুধুই আকাশ। ভালোবাসার নিবিড় বন্ধনে জীবন। এই বন্ধন ছিন্ন হলে, সব কেমন আলগা। সম্পর্কহীনতায় একে অপরের কাছে কত অচেনা, অজানা। দাদার মুখে মায়ের কথা শুনে তার বুকটা টনটন করে ওঠে– সত্যি

কী তাদের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে। সত্যি কী তাদের মা আজও বেঁচে আছে!

জানালা থেকে সরে আসে নীরা। বাণী পিঠে হাত রাখে। বাণী তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছে। নীরা আস্তে আস্তে বাণীকে ডাকে– মা।

নীরার ডাকে সে মুখ তোলে। এক ঝটকায় বুকের কাছে টেনে নেয়। কাঁদতে কাঁদতে বলে– তোরা আর যাই করিস, আমাকে ভুল বুঝিস না, আমাকে ছেড়ে যাস না, তোরা চলে গেলে আমি কী নিয়ে থাকব। আমার আর কে আছে বল। তোদের পেটে ধরিনি বটে কিন্তু, তার চেয়ে তোরা আমার কাছে অনেক অনেক বেশি মূল্যবান।

– চুপ করো মা, চুপ করো। দাদার কথায় রাগ করো না। দাদা কার কাছ থেকে কী শুনেছে, তাই অমন বলছে। নিজের ভুল বুঝতে পারলে আর কখনও এমন বলবে না।

নীরার কথায় হাল্কা হয় বাণী। বিছানা ছাড়ে। চোখে মুখে জল নেয়। রান্নাঘরে ঢোকে। চা করতে বসে। চা করে, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তুহিনের ঘরে ঢোকে। তুহিন শুয়ে আছে চুপচাপ। চোখ বোজা। বাণী হাত রাখে তার মাথায়।

– তুহিন ওঠ, চা খাও। তারপর টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রাখতে রাখতে বলে– ঠিক আছে তোমরা যখন সত্যি জানতে চাইছ, তখন সব বলব। তবে এ সংসারে আসার আগের জীবন বলতে পারব না। বললে তোমরা তা বিশ্বাস করবে না। আমি বলব আমার কথা। বললে গল্প বলে মনে হবে নাতো?

– গল্প! তুহিন শ্লেষের গলায় বলে– আমার বয়সটা তোমারও একদিন ছিল। ওই বয়সে অপরের বা নিজের ভালো মন্দ বোঝার বোধ শক্তি থাকে। তোমারও ছিল, এখন আমারও আছে। কোনটা গল্প কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা শুনলেই ধরতে পারব আশা করি।

বাণী তুহিনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে– আগে চা খেয়ে নাও, সহজ হও, আমি যখন কথা দিয়েছি যতটুকু জানি সব বলব।

তুহিন হাসে। শুকনো হাসি। চোখে উপচে পড়ছে ঘৃণা।

বাণীর তা দেখে ভয় করে। বাণী তার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে বলে– তুহিন তোমরা যা জানো, কিংবা কেউ তোমাদের যা বলেছে তার কোনটাই সত্যি নয়। আমার জন্য তোমাদের বাবা তোমাদের মাকে ডিভোর্স দেননি। আমার আসার চার বছর আগেই ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়। যখন তোমার বয়স চার, আর নীরার মাত্র দু'বছর। তোমার বাবা তখন এক ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। তোমাদের দু-ভাই বোনকে নিয়ে বিব্রত। দিশেহারা, একদিকে দুই অসহায় শিশু, অন্যদিকে ব্যবসার সমস্যা। তোমাদের স্কুলে ভর্তি করার সময় আমার সঙ্গে দেখা। ও আমার সহপাঠী ছিল। তারপর তোমাদের কথা ভেবেই আমরা বিয়ে করি। সেই সময় যদি তোমাদের জীবনে না আসতাম, তবে এতদিনে তোমরা হয়তো কোন অনাথ আশ্রমে মানুষ হতে। কোথায় যে ভেসে যেতে।

– এ তোমার বানানো গল্প।

– না তুহিন, এমনভাবে আমাকে ছোট করো না। একটু সংযমী হও। ভাবতে শেখো। কী অভাব ছিল আমার। স্কুলে মাস্টারি করি। বাবার একমাত্র মেয়ে। আজ যতটুকু আলো দেখছো তার সবটুকু আমার। বিশ্বাস না হয় তোমার বাবা এলে জিজ্ঞেস করে দেখো।

নীরা এসে কখন দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করেনি কেউ। খেয়াল হল নীরার আর্দ্রস্বরে।

– আচ্ছা মা, ওই মায়ের কী এমন অপরাধ ছিল যে .....

– তা আমি কী করে বলব। যা শুনেছি, সে তোমাদের না শোনাই ভালো; শুনলে হয়ত সহ্য করতে পারবে না।

– না, তুমি বলো, যতো কঠিন হোক তা সহ্য করার মানসিকতা আমার আছে। তুহিন দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

– বেশ, তবে শোন, ওকে ব্যবসার খাতিরে কলকাতায় থাকতে হত। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তোমাদের জন্মভূমি মেদিনীপুরের অজ পাড়া গাঁয়ে। সেখানে থেকেও এসেছো। তোমার জন্মদাত্রী মা ওখানেই থাকতেন। তুহিন তোমার স্মৃতি যদি প্রখর হয়, হয়ত মনের পর্দায় একটা ছবি থাকবে। রাত্রি নির্জনতা ভেদ করে একটা জেনারেটরের ঢকঢক শব্দ, কখনো রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটা ছায়ামূর্তি ....।

– হেঁয়ালি না করে সোজাসুজি বলো।

বাণী হাজার চেষ্টা করেও খোলাখুলি বলতে পারল না। জিভে তার আড়ষ্ট ভাব।

তুহিন কঠিন দৃষ্টিতে বাণীকে দেখে! সে দৃষ্টির সামনে বিব্রত বাণী আমতা আমতা করে বলে– তোমার মা পাড়ার এক ছেলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় এই অপরাধে ....।

– না, না। চিৎকার করে ওঠে তুহিন– না, এ হতে পারে না! এ সবই তোমাদের রটনা। নিজেদের পাপ ঢাকতে গিয়ে অন্যের জীবনে কালি ছেটাচ্ছে। তোমরা এত নীচ, আমি আর শুনতে চাই না ....।

– আমিও শোনাতে চাইনি। এতদিন যে কথা কাউকে বলিনি, আজ সে কথা তোমার জেদের জন্যই বলতে বাধ্য হলাম।

নীরা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায়– তুমি যে সত্যি কথা বলছ তার প্রমাণ।

– প্রমাণ! প্রমাণ চাইলে আমি দিতে অপারগ। আমার যতটুকু শোনা তোমার বাবার মুখে। আর আমার বলাতে তোমাদের অনেক কিছু থেকে যাবে। ও ফিরলে ওর কাছে তোমার মায়ের ছবি ও কয়েকটা প্রেমপত্র আছে, দেখতে চাইলে দেখতে পারো।

ঘরের মধ্যে অদ্ভুত নীরবতা। তুহিন এতটাই পাথর যে নড়তে পারছে না! চুপসে যাওয়া বেলুনের মতই সব উত্তেজনা উবে গেছে। একটা যন্ত্রণা তার সারা বুকে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। প্রচণ্ড হিক্কার শব্দ করে কান্না ওঠে। নীরাও একটা উদ্‌ভ্রান্ত পাখির মতই দিশেহারা। বোবা। নির্বিকার।

বাণীর সাজানো পৃথিবী যেন হঠাৎ থমকে যায়। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে যায় সংসার-পাতি। অন্ধকার হাতড়ে খুঁজে জড়ো করতে থাকে। এক এক করে সংগ্রহ করে ভাঙা সংসার, টুকরো ভালোবাসা। জোড়া দিতে থাকে। মনে মনে ভাবে– না, তার হারলে চলবে না। দিবাকরের আমানত সর্বশক্তি দিয়ে বাঁধতে হবে। ওদের কেউ নেই। ওরা অবুঝ আমাকে বন্ধুর মতো ওদের দেখতে হবে। ভাঙলে চলবে না।

বাণী ওঠে, ভেঙে পড়া তুহিনের শরীর আঁকড়ে বুকে তুলে নেয়, আদর ভরা কণ্ঠে বলে– তুহিন এখন তোমরা বড় হয়েছ, ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছ। নিজেদের মতামতের একটা মূল্য আছে। আমি গর্ভধারিণী নই, তবুও মা। ভালোবাসা মায়া মমতা দিয়ে তোমাদের মানুষ করেছি, তারই সুবাদে অন্তত আমার মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করো। আর আমার বলার কিছুই নেই।

বাণীর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তুহিন। বাণী ছেলেকে বুকে আঁকড়ে ধরতে চায়, পারে না।

বাণীর ভালো লাগছিল না। তার মাথার ভেতরে একটি নাম বার বার আঘাত করছিল– 'তুহিন-তুহিন।' যাকে সে খুব ছোটবেলা থেকেই মাতৃস্নেহ দিয়েই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। সেই তুহিন তাকে এমন অপমান করতে পারে; না, ভাবা যায় না। লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে মুখ তুলতে পারছিল না সে।

ছুটির ঘন্টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। অবসন্ন ক্লান্ত বাণী বসেছিল টিচার্স রুমে। সাধারণত শেষের দিকে তার কোন ক্লাস থাকে না। বড়দি আজ বিডি ও অফিসে গেছেন, তাঁর ক্লাসটা আজ তাকেই নিতেই হল। ছুটির ঘন্টা বাজতেই বাণী মেয়েদের বলেছিল– যাও, তোমরা এক এক করে চলে যাও, আমি পরে যাচ্ছি।

ক্লাস টেনের পর্ণা একটু পাকা। বাণীকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে টেবিলের কাছে এসে বলেছিল– মাসিমণি আপনার শরীর খারাপ নাকি?

–না না, এমনি, তোমরা যাও। বাইরে মেঘের আওয়াজ হচ্ছে, বৃষ্টি নামতে পারে।

দেখতে দেখতে ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামল। বাণী চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল জানালার কাছে। সে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইল বৃষ্টির স্বাদ। বৃষ্টির শীতলতা তার শরীর মনকে আরও শীতল করে দিল।

শীতল হতে হতে আরও শীতল হল বাণী। গাছের মতন গুচ্ছ শিকড় চারিয়ে যেতে লাগল তার মনের ভিতর। স্মৃতির মৃদু মৃদু ঢেউ নীল সুখের ভিতর ফিরে ফিরে এল। স্মৃতির নুপুরের নিক্কণে বিমোহিত সে। হারানো দিনগুলো উঠে এল বৃষ্টি রিম রিম শব্দের ভিতরে। বাণী হারিয়ে গেল, বুকের ভিতরে গুচ্ছ গুচ্ছ শিকড়ের অমোঘ টানে।

মানময়ী গার্লস স্কুল। এই স্কুলে বাণী সবেমাত্র চাকরি পেয়ে এসেছে। স্কুলের শিশু বিভাগে অ্যাডমিশান টেস্ট। স্কুলের আসন সংখ্যা মাত্র একশ ষাট। দরখাস্ত জমা পড়েছে কয়েক হাজার। এদের মধ্য থেকে নিতে হবে একশ' চল্লিশ। কুড়িটা কারো না কারো কোটা আছে। বড়দি সুতপা মিত্র বাণীকে একটু আলাদা চোখে দেখেন বলেই, তাকেই ওই বাছাই পর্বে থাকতে হয়েছে। তাছাড়া কৌতূহল ও অভিজ্ঞতার জন্যই থাকার ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছে।

বাইরে জড় হয়েছেন ছাত্রদের বাবা-মা। বেশিরভাগই মায়েরা এসেছেন, 'নীরা' নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই এক দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক ফুটফুটে একটি ছোট মেয়ের হাত ধরে ঘরে ঢুকল। মেয়েটি কিছুতেই ঘরে ঢুকতে চাইছে না। কেঁদে কেটে এক্সা। শীতকাল। গোলাপী রঙের সোয়েটার পরেছিল মেয়েটি। পায়ে সাদা জুতো। মেয়েটি কাঁদছে হাপুস নয়নে। চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে কাজল। সারা মুখ কালিতে মাখামাখি।

বাণী দেখছিল মেয়েটিকে। কপালে ধ্যাবড়া টিপ। মাথার চুল এলোমেলো। গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় কোন অনভিজ্ঞ পুরুষ কিংবা নারী মেয়েটিকে সাজানোর চেষ্টা করছে। মেয়েটি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে– আমি দাবো না, দাবো না, ওরা আমায় মাল্‌বে। যুবকটি হাত ধরে টানছে– না, না, কেউ তোমায় মারবে না, চলো চলো।

– না, দাবো না।

– এমন করে না, চলো।

বাণীর খুবই হাসি পাচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে বড়দির নির্দেশ ছিল, কোনরকম দয়ামায়ার আশ্রয় নয়। কিন্তু ভদ্রলোক ও মেয়েটিকে দেখে তার কেমন যেন কৌতূহল হল। নির্বাচকের আসন ছেড়ে মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়াল। হাঁটু মুড়ে বসে বলল– কে বলেছে তোমাকে মারবে? চল চল তোমাকে অনেক খেলনা দেব। ওই দেখ কত খেলনা।

টেবিলে থরে থরে সাজানো খেলনার দিকে সতৃষ্ণ চেয়ে থাকল নীরা।

– খেলনা, কি খেলনা দেবে বলো?

– যাই চাইবে, হাতি, ঘোড়া, ট্রেন, উড়োজাহাজ, সব।

– সব দেব। চলো তো আগে।

– মাল্‌বে না-তো?

– না, না, কেউ তোমাকে মারবে না।

– আগে তিন সত্যি কর।

বাণী হাসে– সত্যি, সত্যি, সত্যি। হলো তো এবার চলো।

– ন্‌না

– আবার কী হলো?

– আগে পাম্পি দাও।

–তোমার মা বুঝি রোজ তোমাকে পাম্পি দেয়?

– যা, মা দেবে কেন? বাপীন দেয়।

– কেন, তোমার মা?

মায়ের কথা শুনে মেয়েটি হঠাৎ চুপসে যায়। খুব নরম গলায় বলে– আমার মা নেই, মা সোনার দেশে গেছে। বাপীন বলে, ফিরে আসার সময় আমার জন্য একটা আকাশ, আর অনেক তারা নিয়ে আসবে। অনেক ....।

আচ্ছা, আচ্ছা, বাণী থামায়। জিজ্ঞাসু চোখে দেখে সৌম্য পুরুষটিকে। তার চোখের ভিতর থেকে এক অদ্ভুত আলো যেন গড়িয়ে নামছে। পুরুষটি চোখ মুখ শুকনো, ফ্যাকাসে, বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাণীর নারী সত্তা বুঝতে পারল– মেয়েটি বড় অসহায়।

বেশী কথা বাড়ায় না বাণী। বড়দিও তাড়া লাগায়।

–কী হল বাণী, একজনের জন্য এত দেরী হলে চলবে কী করে।

বাণী বড়দির কথায় কান দেয় না। তার বুক মুচড়ে যায়– আহা রে এইটুকুই বয়স থেকেই এমন যন্ত্রণা! বাণী নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে। রুমাল দিয়ে মেয়েটির মুখ মুছিয়ে ছোট্ট করে 'হাম' দেয়। যুবকটির হাত থেকে মেয়েটির বার্থ-সার্টিফিকেট নিয়ে বলে– আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন, পরে ডাকব।

মিনিট পনের পরে ডাক পেয়ে দিবাকর ঘরে ঢুকে নীরাকে দেখে অবাক। যে মেয়ে ঘরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছিল সে এখন নিশ্চিন্তে বসে আছে দিদিমণির পাশে। তার হাতে লাল রঙের বড় পুতুল।

দিবাকরকে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন করে বড়দি সুতপা মিত্র গম্ভীর গলায় বললেন– এক সপ্তাহ পর রেজাল্ট দেখে যাবেন।

চলে আসার সময় মেয়েকে ডাকল দিবাকর। নীরা বাবা ডাকে সাড়া দিল না। বাণী মেয়েটির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, চুমু দিয়ে বলল– আজ যাও, বাপীর সঙ্গে আবার এসো, আরও খেলনা দেব।

মন্ত্রের মত কাজ হল। নীরা চুপচাপ চলে দিবাকরের সঙ্গে।

বাণী দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল নীরাকে।

এক সপ্তাহ পর নীরার রেজাল্ট দেখতে গিয়ে দিবাকর দেখল– চৌদ্দজনের পর নীরার নাম রয়েছে। রেজাল্ট দেখতে সঙ্গে তুহিনও এসেছে। তুহিন হেয়ার স্কুলের ছাত্র। নীরার এখানে সুযোগ হওয়ায় বড়ই সুবিধা হল দিবাকরের। বিশেষ করে আসা যাওয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি। কলেজ ষ্ট্রিটের দোকান ফেরত দু-জনকে একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

স্কুল কম্পউন্ডে বাবা-মা'দের রেজাল্ট দেখার ভিড়। দিবাকর রেজাল্ট দেখে বেরিয়ে আসার সময় টিচার্স রুমে উঁকি দিল– যদি দিদিমণিকে দেখা যায়, অন্তত ধন্যবাদ দেওয়া যাবে। দেখা গেল না। তুহিনও নীরার হাত ধরে বাড়ির দিকে হাঁটছিল দিবাকর। অ্যাডমিশান টেষ্টের দিনে নীরার আচরণের কথা ভেবে সে হঠাৎই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, এই অসতর্ক মুহূর্তে নীরা হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে গেল বাগানের দিকে।

দিবাকর এ্যাই এ্যাই করতে গিয়ে দেখল– দিদিমণি বসে আছেন বাগানে। শীতের শীতল রোদ মাখছে তার শরীর। হাতে সোয়েটার বোনার কাঁটার ছন্দময় চলা। বাগানে ঢুকতেই বাণীর সঙ্গে চোখাচোকি হল দিবাকরের। মুহূর্তের দৃষ্টির ভিতর নারী-পুরুষের মধ্যে কী এমন মোহিত শক্তি আছে, তা ঈশ্বরই জানেন, বাণীও জানে না তার ভিতরের ঘুমন্ত স্নায়ুগুলো কেন রৌদ্রাক্ত সবুজ পাতার মতো তেজোময়দীপ্ত হয়ে উঠল। হৃদপিন্ডে কিসের ধ্বনি! হালকা ফুরফুরে বাতাসে সর্ষে ক্ষেতের হলুদ ফুলগুলি যেমন মাথা দোলাতে দোলাতে ঢেউ দিয়ে যায়, তেমনি এক আন্দোলন হচ্ছে ভিতরে। দিবাকর মন্ত্রমুগ্ধ যুবকের মতো স্বপ্নাবিষ্ট; সুন্দরের স্পর্শে

বিমোহিত।

আড়ষ্ট দিবাকর– হাত জড়ো করে বলল– নমস্কার।

প্রতি নমস্কার জানাল বাণী।

পাশেই তুহিনের দিকে চোখ পড়তেই বাণী জিজ্ঞেস করল– ছেলে বুঝি?

দিবাকর মাথা নাড়ল– হ্যাঁ।

নীরা তখন বাণীর কোলে উঠে বসেছে। দিবাকর হা-হা করে ওঠে– উঃ দিলি তো, দিদিমণির কাপড় খারাপ করে।

– না, ও কিছু নয়। বাচ্চারা অত বোঝে না।

নীরা তখন বাণীর কাছে আবদার করছে– আমাকে খেলনা দাও।

–এখানে তো খেলনা নেই। এই লাল গোলাপটা তোমার, এসো তোমার মাথায় দিয়ে দিই।

– না, ও সব চাই না, আমার রেলগাড়ি চাই, জাহাজ চাই।

– আচ্ছা, যাবার সময় কিনে দেব।

– আপনার ছেলে-মেয়ে দুটি কিন্তু বেশ মিষ্টি। এদের মায়ের কী এমন হয়েছিল?

দিবাকর চুপচাপ। কথা বলল না। দিবাকরকে নিরুত্তর দেখে বাণী আবার জিজ্ঞেস করল– কী হল চুপ কেন?

দিবাকর মাথা নত করে। সত্যি কথা বলতে ভয় পায়। বাণী দুঃখিত গলায় বলে– আহারে এমন দুধের বাচ্চা!

দিবাকর বাণীর মুখে দিকে চেয়ে থেকে একসময় বলে– আপনাকে কিন্তু আমার খুব চেনা মনে হচ্ছে। আপনি ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন, তাই না? আমি কিন্তু আপনার চাইতে এক বছরের সিনিয়র। সেই কারণে হয়ত আলাপ ছিল না। তবে কলেজ ফাংশানে আপনার নাটক, ম্যাগাজিনে আপনার লেখা পড়ে কিছুটা নামের সুখ্যাতি কানে এসেছে। হযত দু-একবার দেখেও থাকবো।

বাণী বলল– ঠিকই ধরেছেন, আমারও আপনাকে খুবই চেনা চেনা মনে হয়েছিল, আপনাকে সবাই দেবু বলে ডাকত; তাই না! আপনি ছিলেন ইউনিয়নের একনম্বর লিডার।

– আপনার সব মনে আছে দেখছি।

– আসলে কলেজ ছেড়েছি কুঁড়ি বছর হল। কুড়ি-বাইশ বছর তো কম নয়। চেহারা, চালচলন কথাবার্তা সব কিছুই বদলে গেছে, আমূল বদলে গেছে। চট করে চেনা যায় না।

– তবুও তো চিনতে পারলাম।

– বাইশ বছর আগের চেহারার সঙ্গে আজকের চেহারা অনেক তফাৎ।

– আপনি এখন কী করছেন?

– রামকৃষ্ণতে প্রফেসারি করেছিলুম কয়েক বছর। এখন বই প্রকাশনীর ব্যবসা করছি। 'পূর্ণ' প্রকাশনী আমারই প্রতিষ্ঠান।

– ও। ওদের কে দেখাশোনা করে?

– কে আর করবে? কেউ নেই। নিজেকে সব করতে হয়। শ্যামবাজারে ফ্ল্যাট নিয়েছি। ছেলে-মেয়ে নিয়ে সেখানেই থাকি। ওরা স্কুলে থাকলে আমি দোকানে। পাশের ফ্লাটে একজন মাসিমা থাকেন তার কাছেই ওরা বেশীরভাগ সময় থাকে।

– তাহলে ওদের খুবই কষ্ট হচ্ছে। স্কুলে ভর্তি হলে ওদের কীভাবে সামলাবেন?

– ভাবিনি এখনও। এবার কিছু ভেবে দেখতে হবে। দেখি কী করা যায়।

–এত কষ্টের চাইতে বিয়ে করে আবার নতুন জীবন শুরু করুন।

বিয়ে! কথাটা শুনে চমকে উঠল দিবাকর। সারা শরীরে এক আগুনে স্রোত। নারীর অবিশ্বাসী কুটিল মুখ চোখের সামনে ভাসে। দিবাকর যেন পুরনো যন্ত্রণা আবার ফিরে পায়। স্ত্রী সরমার চলে যাবার পর নারী জাতটার প্রতি তার বিদ্বেষে মন ভরে গেছে। তীব্র ঘৃণা তার সারা শরীরে গাঢ় বিষের মত ছড়াতে থাকে, যাতে ক্রমশঃ বিবশ হয়ে ওঠে দিবাকর। বিয়ে সংসার, ভালোবাসা শব্দগুলোর প্রতি ঘন কালির প্রলেপ দেয়। সে মুছে দিতে চেষ্টা করে, পারে না। দুধের মতো সরল বাচ্চা দুটোকে নিয়ে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে, দেখতে চায়। কিন্তু, সবার কেন্দ্র যে নারী; তার মায়া মমতার প্রতি এতটুকু বিশ্বাস নেই। তবু মন শক্ত করে দিবাকর। ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বাঁচার খেলায় মেতে ওঠে। প্রতিদিনের সূর্য, রোদ-বৃষ্টি, শ্বাস-প্রশাসের ভিতর নতুন জীবনের গন্ধ পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। প্রার্থনা করে সুন্দর একটি জীবনের।

জীবন বোধের এই অপরিসীম অন্ধকার থেকে সে আহত কণ্ঠে কষ্টের হাসি হেসে বলে– বিয়ে, করব বললেই কি করা যায়? তাছাড়া এমন কোন উদার নারী আছেন যিনি দু-দুটো বাচ্চার ভার বহন করে আমার সহধর্মিনী হতে রাজী হবেন। ওসব আকাশ-কুসুম কল্পনা না করাই ভালো।

–পৃথিবী বড় উদার দিবাকর বাবু। এই উদারতার জন্য আজও পৃথিবী তার সুন্দর বোধগুলো সমানভাবে ধরে রাখতে পেরেছে। আজও গাছে গাছে ফুল ফোটে। বসন্ত আসে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, পরিবর্তনের পর পরিবর্তন ঘটিয়ে, নিজের সাযুজ্য বজায় রেখেছে। পৃথিবীর উদারতায় কোন না কোন নারী আরও উদার হয়ে একদিন না একদিন ধরা দেবেন। তা না হলে পৃথিবীর সুন্দর সবই নষ্ট হয়ে যাবে।

দিবাকর শান্ত স্বরে বলল– হয়তো বা পাবো, কেউ না কেউ এমন উদারতা দেখাবে, কিন্তু বড় ভয় করে। ছোটবেলা থেকে যে জীবনটার স্বপ্ন দেখতাম, যে স্বপ্নের প্রতিটি পাপড়ি বাস্তবায়িত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যাবসায়ের ফলে আজ গাঁ থেকে কলকাতায় এসেছি, লোকের বাড়িতে থেকে, ছেলে পড়িয়ে, একাজ-সেকাজ করে মাথা উঁচু করে বাঁচার কথা ভেবেছি, জীবনের অন্য অন্ধকার দিকগুলোর কথা ভাবিনি একদিনও– অথচ কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল– ঈশ্বর জানেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরও বলল– আজ এ-দুটো বাচ্চা ছাড়া বাঁচার কোন অবলম্বন নেই আমার। দিশাহীন সমুদ্রে আমি খড়কুটোর মতো ধরে আছি এই অবলম্বন। এদের হারালে কোন অতলে তলিয়ে যাবো আমার জানা নেই।

দিবাকরের দিকে চেয়ে বাণী বুঝল, দিবাকরের ভিতরটায় একটা দুঃখের পাহার ভেঙে পড়তে চাইছে যেন। ক্লাসের ঘন্টা বাজতেই,বাণী চলে যায়।

বাণী চলে গেলে হঠাৎ অতনুর মুখ মনে পড়ল দিবাকরের আতনু সান্যাল। দিবাকরের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল একটা মিটিংয়ে। ইউনিয়নের ইলেকসানে দু-দলের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে অতনু খুবই মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। সেই সময়ে অতনুর মুখে প্রথম বাণীর নাম শুনেছিল। কয়েকবার কফি হাউসে ওদের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকতে দেখেছে। হঠাৎ অতনুও কথাটা কেন-ই বা মনে পড়ল বুঝতে পারল না দিবাকর। কে জানে অতনু কোথায় আছে? বাণীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে কিনা তাও তার জানা নেই। বাণীকে দেখে সে রকম কিছু মনে হল না। মাথায় সিঁদুর দিয়েছে কী! মনে করতে পারল না সে। আজকাল মেয়েরা মাথায় সিঁদুরও দেয় না। এ-সব উঠে যাচ্ছে। বাণী সম্পর্কিত কৌতুহল নিয়ে দিবাকর ছেলে-মেয়ের হাত ধরে ফিরতে থাকে। জীবন চলমান। পৃথিবীর আবর্তিত গতির সঙ্গে সাযুজ্যের ফলেই কোথাও কিছু স্থির নেই। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বদলে যায় অজান্তে, অন্যভাবে।

বৃষ্টির কণারা বাণীকে স্পর্শ করেছিল। মনের শুকনো ভূমির উপর বৃষ্টির শৈত্য তাকে বিবশ করে দিচ্ছিল। জানালার সামনের জবা গাছটার পাতা বেয়ে বৃষ্টি নামছিল। মেঘেরা গর্জন করছে। চারপাশে ঘন অন্ধকার নামছে। বৃষ্টিস্নাত পৃথিবী আরও মলিন হচ্ছে ধীরে ধীরে।

দারোয়ান চাঁদ সিং দরজা বন্ধ করতে এসে বলল– দিদিমণি বাড়ি যান, বৃষ্টি থেমে গেছে।

– হ্যাঁ, চলো।

রাস্তায় বেরিয়ে বাণী বুঝল, ঘন্টাখানেকের বৃষ্টিতে কলকাতা শহর ছোট খাটো নদীতে পরিণত হয়েছে। ট্রাম বাস রিক্সা দাঁড়িয়ে। বস্তির ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় সাঁতার কাটছে। এত জল ভেঙে হেঁটে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। স্কুলের ছাত্রী-দিদিমণিরা জটলা করছে সামনে। বেশ কয়েকজন রাস্তার নোংরা জল ঠেলেই হাঁটা দিচ্ছে। সে কী করবে বুঝতে পারল না। জল কমতে কমতে ঘন্টা তিনেক। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটাও অসম্ভব। জল ঠেলে ঠেলে দু-একটা বাস যাচ্ছে। যা আছে কপালে এমন কিছু ভেবে ফাঁকা ট্রামে উঠে জানালার ধারের সীটে বসল।

তার মতই দু-চার জন বসে আছে। ট্রামে করে আপাতত রিপন স্ট্রিট পর্যন্ত যাওয়া যাবে; ওখান থেকে তালতলায় যেতে অন্য কিছু ভাবা যাবে। উল্টোদিকে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তাছাড়া ওদিকটায় এত জল জমে না।

আবার বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি, বৃষ্টি। ঝর ঝর, ঝম ঝম একটানা বৃষ্টি! বৃষ্টির গন্ধে বছর কয়েক আগের ঘটনায় ডুবে গেল সে।

..... সকাল দশটা। এরই মধ্যে কলকাতা শহর একেবারে নিস্তব্ধ। রাস্তায় লোকজন নেই। মনে হচ্ছে বৃষ্টিও যেন তাদের অধিকার দাবীতে কলকাতা বন্ধের ডাক দিয়েছে। ভরা শ্রাবণে বৃষ্টি হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে মনে হচ্ছে; মাথার ওপর ঘোলাটে শ্বেত পাথরের গামলাটা যেন ফুটো হয়ে গেছে। অবিরাম ঝরেই চলেছে। তার সঙ্গে চলেছে মেঘেদের একসঙ্গে ড্রাম পেটানোর প্রতিযোগিতা।

বাণীর স্কুল এগারটা। স্কুলে পৌঁছে বাণী দেখল ছাত্রীদের উপস্থিতির হার খুবই কম। কাছে পিঠে যারা তারাই এসেছে। সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু এ-ক্লাস ও ক্লাস ঘুরে নীরার ক্লাসে এসে মনটা তেতো হল তার। যার জন্য স্কুলে আসা, সেই আসেনি।

এ যে তার কী হয়েছে। নীরাকে একদিন না দেখলে তার মন আকুল হয়ে ওঠে কেন? এ কী নীরার জন্য কোন মায়া কিংবা মমতা না অন্য কিছু। বাণী তার নিজের অসহায়তা নিজেই বোঝে না। স্কুল, বাড়ি, পড়ানো এসবের ভিতর তার জীবনের বাঁচার রসদ রয়েছে। এদের মধ্যেই কেটে যাচ্ছিল বেশ। বাড়ি ফিরে একাকি যেন আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। কিছুই ভালো লাগে না তার। একটা ছোট্ট মুখ; ছোট্ট কথা, মায়াময় দুটি চোখ। অসহায় দিবাকর নামক মানুষটার নির্বিকার থাকা সবই একসঙ্গে তাকে ভাবায়। এর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বাণী হেরে যায়। কখনও অনিদ্রায় ভোগে, কখনও গাঢ় ঘুমে স্বপ্নের রঙে বিভোর হয়ে ওঠে।

সারা স্কুলে সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশ-ষাট জন এসেছে। বড়দি বললেন– ফার্স্ট পিরিয়ডের পর ছুটি দিয়ে দেবো। আজ রেনি-ডে।

স্কুল ছুটি হলে রাস্তায় বেরিয়ে বাণীর চক্ষু স্থির। স্কুল গেটে অনেকে দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ হাঁটুর উপর কাপড় তুলে হাঁটছে। মরে গেলেও বাণী হাঁটুর কাপড় তুলে হাঁটতে পারবে না, তার ভীষণ লজ্জা করে।

একটা খালি টানা রিক্সা দেখতে পেয়ে ডাকলো বাণী– এ্যাই তালতলা যায়েগা?

– নেহী, উধার একদম ডুব গিয়া।

বাণী বুঝল, বৃষ্টির জন্য রিক্সাওয়ালা সুযোগ নিচ্ছে, বেশী জেদাজেদি করলেই বিশ পঁচিশ টাকা চেয়ে বসবে।

রিক্সা চলে গেলে ফুটপাত ধরে হাঁটা দিল বাণী। উদ্দেশ্য যতদূর যাওয়া যায়। হাঁটতে হাঁটতে কলেজ ষ্ট্রিটের ক্রসিংয়ের কাছে এসে দেখল উল্টোদিকের ফুটপাতে দিবাকর হাঁটছে। জলে ভিজে একেবারে ঝোড়ো কাক। দিবাকরের কাঁধে তুহিন, কোলে নীরা। রাস্তা পার হচ্ছে। তুহিন শীতে কাঁপছে হি হি করে। এই দৃশ্য দেখে বাণীর বুক হু হু করে ওঠে। একজন পুরুষের অসহায় অবস্থা দেখে সে খুবই বিমর্ষ হয়, কষ্ট পায়।

দিবাকরকে জোরে ডাকতে গিয়ে থামে সে। ইচ্ছে করছিল ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলে। পারল না। আড়ষ্টতা তাকে ছেঁকে ধরল। বাণী চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকল।

হঠাৎ দেবদূতের মতো তার সামনে উদয় হল পরিচিত এক স্কুল ভ্যান। বাণীকে দেখে ড্রাইভার চিৎকার করে বলল, উঠে আসুন দিদিমণি।

গাড়িতে উঠে বাণী বলল, তুমি কি শিয়ালদার দিকে যাবে?

– হ্যাঁ, ওদিক দিয়ে গেলেই সুবিধা হবে।

বাণী তাকে অনুনয়ের স্বরে বলল, দেখ ভাই দেখ একজন অসহায় ভদ্রলোক দুটো বাচ্চা নিয়ে জলের মধ্যে হাঁটছে, ওদের তুলে নাও, ও আমার বিশেষ পরিচিত।

ড্রাইভার কোন কথা না বলে গাড়ি নিয়ে দিবাকরের সামনে দাঁড়াল।

বাণী জানালা থেকে মুখ বার করে ডাকল– দিবাকর বাবু উঠে আসুন।

দিবাকর অপ্রস্তুত। চোখে মুখে কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে নিঃশব্দে উঠে বসল।

গাড়িতে উঠতেই বাণী ধমকের স্বরে বলল, এভাবে বাচ্চাদের নিয়ে কেউ পথে বের হয়? কী দরকার ছিল আজকের দিনে বেরুনোর। অসুখে পড়বেন যে।

– কী করব! পাশের বাড়ির মাসীমা মেয়ের বাড়ি গেছেন। তাছাড়া এই বৃষ্টিতে দোকানের বই পত্তর ভিজে যাচ্ছিল কিনা, দেখতে আসাটা ভীষণ দরকার ছিল, তারপর নীরা, দিদিমণির কাছে যাবো, যাবো করে এমন জেদ ধরল– তাই না এসে উপায় ছিল না।

বাণী চুপ। নিজের আঁচল দিয়ে তুহিন ও নীরার মাথা মুছিয়ে দিল।

দিবাকর মৃদু প্রতিবাদ করল– এ কী করছেন! শাড়ীটা খারাপ হয়ে যাবে যে।

– শাড়িটা এমনি ভিজে গেছে। আপনি চুপ করে বসুন তো। আর ভদ্রতা দেখাতে হবে না। এই নিন, আপনার মাথাটাও মুছে ফেলুন।

দিবাকর আড়ষ্ট। বাণীর আঁচলে কিছুতেই মাথা মুছতে চাইল না। লজ্জা পেল।

দিবাকরকে আড়ষ্ট দেখে বাণী বলল, এখানে কেউ নেই দিবাকর বাবু, আগে নিজে বাঁচুন তারপর না হয় লজ্জায় মুখ ঢাকবেন। সর্দি লেগে জ্বল হলে এদের কী হবে বলুন তো?

দিবাকর অবাক চোখে দেখলো বাণীকে। ভ্যানটা শিয়ালদার কাছাকাছি এসে জ্যামে পড়লো। এদিকে এতো জল জমেনি। শিয়ালদা স্টেশনের সামনে নামল দু'জনই।

দিবাকর বললো– চলুন কোথাও চা খাই। আপনি আমার জন্য কষ্ট করে এতদূর এলেন– খারাপ লাগছে।

– তা একটু আধটু লজ্জাবোধ থাকা ভালো।

সামনের স্টলে চা খেতে খেতে দিবাকর জিজ্ঞেস করলো– আজ স্কুল তো ছুটি হয়ে গেলো।

– হ্যাঁ।

– এখন কি বাড়ি ফিরবেন?

– কোথায় আর যাবো।

– অসুবিধা না থাকে চলুন না আমার বাসায়, বসে বসে গল্প করা যাবে।

নীরা ও তুহিন বাণীকে বিব্রত করলো– চলুন না দিদিমণি– চলুন না।

দুই নির্বোধ শিশুর ডাকে কি এমন মুগ্ধতা ছিল, বাণী না করতে পারলো না। হাতের ঘড়ি দেখে বললো– দেরি হলে মা ভাববে।

– ঠিক সময়মতো ছেড়ে দেবো।

অগত্যা বাণীকে রাজি হতে হলো।

বাসায় ফিরে খুবই অপ্রস্তুত হলো দিবাকর। একতলায় থাকে ওরা। ঘরের জিনিসপত্র যত্রতত্র ছড়ানো। বাণীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দিবাকর বললো– একটু দাঁড়ান, ঘরটা গুছিয়ে নিই।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার। কলিকাতা আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। রিকশার টুংটাং, বাসের হর্ন; পরিচিত শব্দরাশির ভিতরে স্বভাবসিদ্ধ জীবনের ছবিগুলো ফুটতে থাকে।

ঘরে ঢুকে বাণী তাড়া দিলো দিবাকরকে– যান তো মশাই, আগে কাপড় ছাড় ন; ওদের শুকনো জামা-কাপড় দিন। অসুখ বাধিয়ে বসবেন যে।

আলমারি খুলে দিবাকর ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড় বের করে দিলো, নিজে বাথরুমে মুখ-হাত ধুতে ঢুকলো। তারপর পাজামার উপর ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি পরে এলো। তুহিনও জামা-প্যান্ট ছেড়েছে। নীরার পরনে হলুদ রঙের ফ্রক।

ঘরে ঢুকেই ঘরের শ্রী দেখে অবাক হলো দিবাকর। বিছানার চাদর টান-টান করে পাতা। লেখার টেবিলের এলোমেলো বইপত্তর গোছানো। বুক শেলফের বইগুলোও ভালো মানুষের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাণীকে কাজে সাহায্য করছে নীরা। বাণীকে ঘর গোছাতে দেখে 'থ' হয়ে গেলো দিবাকর।

বাণী পশ্চিমের জানালার পর্দা খুলতে খুলতে বললো– বেরুনোর সময় জানালা বন্ধ করে যাননি? জলের ছিটেয় সব ভিজে গেছে।

বিমোহিত দিবাকর বললো– থাক না এসব। আপনি ক্ষণিকের জন্য এসে সব বদলে দিয়ে যাচ্ছেন। এ বদলানোর সুখ কি ধরে রাখতে পারবো? কাল থেকে আবার এলোমেলো।

বাণী মুহূর্তে চঞ্চল হলো। বললো– তবুও যদি কিছুক্ষণ ধরা যায়। তাছাড়া ক্ষণিকের সৌন্দর্যই তো মানুষকে স্বপ্নাতুর করে তোলে। আপনি না হয় আজ থেকে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শিখবেন। তার সুগন্ধে আমিও তৃপ্তি পাবো।

দিবাকর অবাক হয়ে দেখে বাণীকে।

তুহিন-নীরা বাবার বুটের ভেতর থেকে একজোড়া মোজা বের করে নাকে হাত চাপা দিয়ে বাণীর সামনে নিয়ে গিয়ে বললো– মাসিমণি কি গন্ধ!

নীরা নাকি সুরে বললো– বাপীন না ভীষণ নোংরা।

দিবাকর নীরাকে ধমক দিলো– এই, আবার ইয়ার্কি হচ্ছে।

তুহিন-নীরা হাসে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দিবাকর চা করতে যাচ্ছিলো। বাণী তার হাত থেকে চায়ের কাপ কেড়ে নিয়ে বললো– বসুন এখানে, আজ আমি আপনাকে চা করে খাওয়াবো।

দিবাকর আপত্তি জানালো। বাণী শুনলো না। ফ্রিজ থেকে মাখন আর পাউরুটি বের করে নিলো।

চা-টোস্ট খেতে খেতে গল্প করছিলো চারজনে। নিছক গল্প।

একটি নীড়হারা পাখি যেমন নীড়ের গন্ধ পেয়ে আত্মস্নিগ্ধতায় খোঁজে খড়কুটো, দিবাকরও তেমনি একটি সম্পূর্ণ নীড়ের গন্ধ পাচ্ছিলো। জীবনযাপনের বাস্তব চিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে ঘুরেফিরে আসছিলো। কথার মধ্যে এলোমেলো যাত্রাপথের দিশাহীন ঠিকানায় পৌঁছানোর নিছক স্বপ্ন!

স্বপ্নঘোরে দিবাকর বাণীকে দেখছিলো আগামী দিগন্ত ভরানো রোদ্দুরের পরিপূর্ণতায়– কিন্তু ছুঁতে ভয় পাচ্ছিলো

সে। নীরা বাণীর কোলের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। এই মাস সাতেকের পরিচয় যে এতো গাঢ় হতে পারে, একেকজন এতো আপন হতে পারে, দিবাকর ভাবতে পারেনি।

বাণীর কোল যেন নীরার এক নিশ্চিন্ত পৃথিবী। তুহিন বসে আছে বাণী দিদিমণির কাছ ঘেঁষে। একটু যেন আনমনা, গম্ভীর।

মাতৃহীন দুই শিশুর সামান্যতম নির্ভরতার আশ্রয় দেখে দিবাকর তৃপ্তি বোধ করলো, আবার ভয়ও পেলো।

দিবাকর তুহিনকে বললো– যাও বাবু ও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

মেঘে মেঘে এতো বেলা হয়ে গেছে কেউ বুঝতে পারেনি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ যেতেই দেখলো– একটা বেজে গেছে। বেলা হয়ে গেছে দেখে বাণীকে যেতে দিলো না দিবাকর। রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে বললো– আপনি এক কাজ করুন– কথা শোনার আগেই বাণী বাধা দিলো– এভাবে আপনি-আপনি করলে আমার এখনই চলে যাওয়া ভালো?

– না, ওগুলো অভ্যাস... আচ্ছা এবার থেকে তুমিই বলবো।

– বলো কি বলছিলে?

– বলছিলাম, ঘরে বাজার তো কিছুই নেই। সামান্য চাল, ডাল, ডিম আছে। এতো বেলা বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। খিচুড়ি তৈরি করো, খেয়ে না হয় যাওয়া যাবে।

বাণী আপত্তি করলো না। হেসে বললো– বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি ভালোই হবে।

দিবাকরকে বসিয়ে বাণী রান্নাঘরে গেলো। দিবাকর বসে গেলো বইয়ের প্রুফ দেখতে– সামনের সিজনে একগাদা বই প্রকাশ করতে হবে।

খেতে খেতে বার বার খিচুড়ির তারিফ করলো দিবাকর– বিউটিফুল– বিউটিফুল!

তার চোখের কোণে জলকণা চিকচিক করে উঠলো। যা বাণীর চোখ এড়ালো না। দিবাকরের দিকে চেয়ে বাণী নিঃশব্দ হলো। একেকজন মানুষের বাইরে থেকে ভেতরের যন্ত্রণাকে কোনোমতে ছোঁয়া যায় না। ভেতরের কষ্ট কি কৌশলে ঢেকে রাখে। দিবাকরের কষ্টকে খুবই ছুঁতে ইচ্ছে করছিলো বাণীর। হাজার চেষ্টা করেও পারলো না সে।

ট্রামটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যেতেই সম্বিত ফিরে পেলো বাণী। জানালা দিয়ে দেখলো, মেঘের পর মেঘ ছুটে যাচ্ছে কোথাও। তার মনে হলো, মেঘ নয়– একগুচ্ছ সাদা-কালো ঘুড়ি, কোনো বালকের হাতের কৌশলে উড়ছে আকাশে। হঠাৎ সুতো কেটে ওলোট-পালোট হয়ে আকাশের বুক চিড়ে উড়ে যাচ্ছে দূর পথে, কোথায় কে জানে।

ট্রাম থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো সে। দরজায় পা রাখতেই তার বুকটা ভরে গেলো অজানা ভয়ে।

অনেকক্ষণ ডোর বেলের বোতাম টিপে বিরক্ত হলো বাণী। বেল বেজেই যাচ্ছে, অথচ কারও সাড়া পাচ্ছে না। সবে যখন ভয় পেতে শুরু করেছে তখনই দরজা খুললো নীরা। নীরাকে দেখে বাণী ঝাঁজ দেখালো, কি ব্যাপার ঘুমিয়ে ছিলে নাকি?

অপরাধী মুখ করে নীরা বললো– হ্যাঁ!

– তুহিন কোথায়?

– বেরিয়েছে।

– কখন?

– তুমি স্কুল বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর।

– কিছু বলে গেছে?

– না।

– বাণী চুপ। সামনের দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার ভেতর একটা কালো পোকা বাসা বাঁধে। কুট্‌কুট্‌ করে কাটে। তুহিন যদি না-ই ফেরে, তবে দিবাকরের কাছে মুখ দেখাবে কি করে। দিবাকর হয়তো বলেই বসবে– তোমার জন্য ছেলেকে ধরে রাখা গেলো না, নিজের মা হলে কি এমনভাবে ছেলে ঘরছাড়া হতো। পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ, আত্মীয়-স্বজন সবাই তার দিকে আঙুল তুলে দেখাবে– তুমি দোষী।

বাণীর মাথা ঘোরে! কি করবে সে। নিজে মনে মনে শক্ত হয়। তাকে আরও শক্ত হতে হবে। দিবাকর না ফেরা পর্যন্ত নিজের জীবন দিয়ে এ আমানত তাকে আগলে রাখতে হবে। কিন্তু তুহিন! তুহিনের ঘৃণাভরা মুখটা চোখের সামনে ভেসে থাকলো। প্রলাপ বকার মতো বিড় বিড় করে বলতে থাকলো- বিশ্বাস করো তুহিন, বিশ্বাস করো, তোমার মা চলে যাওয়ার জন্য আমি কোনোমতেই দায়ী নই। আমি তোমাদের সংসারে এসেছিলাম নিষ্পাপ দু'টি জীবনের কথা ভেবে।

বাণীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে নীরা বললো– চা করে দেবো!

– করো।

বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বাণী জিজ্ঞেস করলো– আমি চলে যাওয়ার পর তুহিন আর কিছু বলছিলো?

– না, তবে ওর মনে কারা যেন বিষ ঢেলেছে। ওর ওই একই প্রশ্ন, একই বিশ্বাস; মায়ের ডিভোর্সের পেছনে তোমার বড় ভূমিকা রয়েছে।

– আচ্ছা, ও এখন কোথায় যেতে পারে বল তো? আজকাল কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে। কারা ওর মন ভাঙছে, কারা আমাদের সুখের ঘরে আগুন দিচ্ছে?

নীরা আহত স্বরে বলে– দাদা অনেক বদলে গেছে। আচার-আচরণ সবই এলোমেলো। আমার ভয় করছে।

বাণী আশ্বস্ত করলো– কোথায় আর যাবে। কাছেপিঠে কোথাও গেছে, ফিরে আসবে। বলেই মনে মনে প্রার্থনা করলো– এ যেন সত্যিই হয় ঈশ্বর।

নীরার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো– আচ্ছা তোমারও কি তুহিনের মতো আমাকে সন্দেহ হয়?

নীরা আনমনা হয়ে নিচু স্বরে বললো– এই আঠারো বছর পর্যন্ত যার মুখও কখনও দেখিনি, যার স্নেহ-আদর-মমতা-ভালোবাসা কোনো কিছুই স্পর্শ করেনি, তার জন্য আমার অতো চিন্তা নেই। জ্ঞান হওয়া অবধি যাকে মা বলে জানি, যার ভালোবাসায় আজও জীবনের আলো পাচ্ছি, তাকে ভুল বুঝি কি করে। বলে দু'হাতে বাণীকে জড়িয়ে ধরে।

বাণী শীতল হয়। তার বুকের ভেতর মৃদু তরঙ্গ। নীরার হাত নিজের হাতে নিয়ে আদর করতে করতে বললো– যাও তুমি পড়তে বসো। কিছুক্ষণ দেখি, তারপর না হয়...।

ও ঘর থেকে নীরার সুকোমল কণ্ঠস্বর–

'মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে

ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চলে...'

কবিতার প্রতিটি শব্দ বাণীকে স্পর্শ করে যায়। ছেঁড়া ছেঁড়া ধূসর মেঘ ঢেকে দিয়েছে তার পৃথিবী। তার সুদূরতম পথ। বিশাল প্রশস্ত পথ। সুন্দর এক পৃথিবী তার সামনে উড়ে উড়ে আসে। আচ্ছন্ন হয়ে যায় বাণী।

এমন এক পৃথিবী ছিলো তার। নিজস্ব কোমল পৃথিবী...।

বাণীর সংসারে আপন বলতে ছিলো মা-বাবা, একমাত্র ছোট ভাই। বাবা রিটায়ার করেছেন বছর তিনেক। বাণীর একার আয়ের ওপর সংসার চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। মা, জয়তীর সর্বদাই এক ভয়– বাণীর কিছু হলে সংসার অচল হয়ে পড়বে। যতদিন না ভাইকে দাঁড় করতে পারছে ততদিন বাণীর সুখের কথা ভাবতে পারছে না কেউ। বাণীরও তেমন কোনো ইচ্ছা নেই। বাণী জানে, তাকে এমনি এক আবর্তের মধ্যে দিন কাটাতে হবে। স্বপ্নের ভাঙা টুকরোগুলোকে নিয়ে খেলতে হবে। কখনও জোড়া দিতে পারবে না। জোড়া দিতে দিতে হয়তো যৌবন শেষ হয়ে যাবে। বিয়ে-সংসার এসব স্বপ্ন দেখার ফুরসত পায়নি সে। পারতপক্ষে বাণীর কাছে কেউ কখনো বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেনি।

সেদিন সারাদিন দিবাকরের বাড়িতে কাটিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছিলো বাণী। মনটা বেশ উৎফুল্ল। একটা চাপা আনন্দ আন্দোলিত হচ্ছিলো সারা শরীরে। ফিরেই বিছানায় গড়িয়ে পড়লো বাণী। এতো তাড়াতাড়ি বিছানায় গড়িয়ে পড়তে দেখে মা জয়তি দেবী জিজ্ঞেস করলেন– কিরে এতো তাড়াতাড়ি শুতে গেলি যে, কিছু খাবি না?

– না মা, আমার ক্ষিধে নেই।

– কেন, শরীর খারাপ নাকি?

– তেমন কিছু নয়। আসলে এক বন্ধুর বাড়িতে খুব খেয়েছি।

বিছানায় শুয়েই তন্দ্রা আসছিলো বাণীর। একরকম আচ্ছন্নতা তাকে পেয়ে বসেছিলো। দিবাকরের বাড়িতে থাকাকালীন স্বপ্নের গভীর রঙ তার চোখেমুখে। আচ্ছন্নতার ভেতর বাণী শুনতে পেলো, একটা ছোট্ট মেয়ের আদরভরা কণ্ঠ, তার শীতল হাতের স্পর্শ। 'মাসিমণি' একটি শিশুর গভীর অথচ মধুর ডাক। স্বপ্নের ঠোঁটে উড়ে এলো সেই দৃশ্য ...

দিবাকর সাদা পাজামার ওপর ঘিয়ে পাঞ্জাবি পরে বসে আছে খাটে। কোলের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে নীরা। দিবাকর আচমকা এমন প্রশ্ন করবে ভাবতেও পারেনি বাণী।

দিবাকরের প্রশ্নে বিমূঢ় সে। দিবাকর বুঝতে পেরে বলে– তোমার অসুবিধা থাকলে উত্তর দিতে হবে না।

– আরে না, অসুবিধার কিছু নেই। তুমি অতনুর কথা জিজ্ঞেস করছিলে তো?

– হ্যাঁ।

– অতনু, আমার জীবন থেকে মুছে গেছে দিবাকর। বলেই খাটের বাজু ধরে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে।

দিবাকর আবার বলে– কেন, অতনু তোমাকে বিয়ে করেনি?

– তা আর সম্ভব হয়নি।

– কেন? অতনু কি অন্য কাউকে বিয়ে করেছে?

– না। সেরকম কিছু নয়।

– তবে?

বাণী চুপ থেকে বললো– দিবাকর, পৃথিবীর প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে ঘটনার পরম্পরা। ঘটনা-দুর্ঘটনা যাই বলি না কেন, তা যে কখন কার ওপর আসবে আমরা কেউ বলতে পারবো না। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে চলছে মানুষের জীবন। এ জীবন এতো সহজ-সরল নয়। যতোটা সহজভাবে ভাবি আমরা।

দিবাকর এক ঝলক বাণীকে দেখে বললো– অতনু কোথায়?

– মারা গেছে।

মারা গেছে! শুনে হোঁচট খায় দিবাকর- কেন? কিসে মারা গেলো।

– পুলিশের গুলিতে।

– পুলিশের গুলিতে!

– হ্যাঁ, তুমি তো জানো, আমরা দু'জনই ছিলাম রাজনীতির পোকা। কলেজ থেকেই ওই নেশা আমাদের পেয়ে বসেছিলো। সত্যিই-ই আমাদের ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিলো না। কিন্তু ও যে ভেতরে ভেতরে নকশাল মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে গেছিলো তা জানতাম না। কলেজ পাস করে বাবার এক বন্ধুকে ধরে স্কুলের চাকরি পেয়ে গেলাম। অতনু কোথায় হারিয়ে গেলো। এখানে-ওখানে খোঁজখবর করি– পাই না। মাঝে মাঝে মনে হতো, ও বোধ হয় আমাকে ছেড়ে চলে গেছে কিংবা প্রতারণা করেছে। ওর বাড়িতে একবারমাত্র গিয়েছিলাম। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ওর ভরসায় বেঁচে আছে বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাই-বোন। ও পাস করে চাকরি পেলে সংসারে সুরাহা হবে। বাবা সামান্য মাইনেতে প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে সংসারটা কোনোমতে চালাতেন। তিনিও অ্যাকসিডেন্টে পা ভেঙেছেন। সে পায়ে আবার পচন ধরেছে। আর এদিকে অতনুর ভেতর গড়ে উঠেছে বিরাট স্বপ্ন। সামাজিক ব্যাধি, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশে পরিবর্তন আনার অঙ্গীকারে সে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছে। পুলিশ, জোতদার, জমিদারের বিরুদ্ধে চলছে তার তীব্র হুঙ্কার। ঠিক সেই সময়ই অতনুর বাবা মারা গেলেন। অসহায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় সংসারে অতনু হাল ধরতে গিয়ে পারলো না। একটা চাকরি যোগাড় করতে পারলো না কোনোমতে। এখানে-ওখানে ঘুরে অবশেষে ওর বাবার কোম্পানি থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুয়িটির পয়সা চাইতে গিয়েই কথা কাটাকাটিতে হঠাৎই কোম্পানির ম্যানেজারকে মেরে বসে। তারপর ফেরার হয়ে যায়।

তখন কলিকাতা শহর, গ্রামবাংলা এমনকি সারা পশ্চিম বাংলায় চলেছে এক জরুরি তৎপরতা। খুনের পর খুন। পুলিশের ধারণা, এসবের মূলে ওই অতনুও আছে। পুলিশ তাকে ছাড়লো না। একদিন পুলিশের জালে ধরা পড়ে গেলো সে। তারপর রাতের আঁধারে জেল থেকে পালিয়ে এসেছে।

একটানা কথা বলতে বলতে হাঁপায় বাণী। ঘরে তখন হালকা অন্ধকার। একটা তেলাপোকা জানালা থেকে ঘরে ঢোকে। ফল ফর করে উড়ে বেড়ায়। এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে ধাক্কা খায়। তারপর ওড়ে, আবার পড়ে যায়।

পুরনো আয়নায় মুখ দেখতে থাকে বাণী। পারা-চটা আয়নায় মুখটা বিবর্ণ দেখায়, তবুও মুখের প্রতিটি রেখা পড়তে চেষ্টা করে। জীবনের ধূসরতার গভীরে মমতার হাত রাখে তৃপ্তি পায়। কখনও তৃপ্তি পায় না। কখনও বিমর্ষ হয়। একটা চাপা যন্ত্রণা তার বুকে ধাক্কা দেয়।

অন্ধকারে দিবাকর সস্নেহে বাণীর মুখ দেখে। বাণীর জন্য এক ধরনের দুঃখ তার শরীর ছেয়ে আসে।

দিবাকর বাণীকে ডাকতে গিয়েও থামলো। ডাকলো না। দেখে মনে হলো– এই মুহূর্তে বাণী শিক্ষিকা নয়, একজন স্মৃতি ভারাক্রান্ত নব্বই বছরের বুড়ি। চোখ-মুখ যেন ঝুলে পড়েছে ঘটনার ভারে। বিগত জ্যোৎস্না তার বুকের পাথর ঠেলে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সেই জ্যোৎস্নায় মধুর হয়ে উঠছে বাণীর মুখ।

নীরাকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয় বাণী। দিবাকর সিগারেট ধরায়। জানালা খোলে। ঘরে এক ঝলক বাতাস ঢোকে। শীত করে। বাণী খোলা জানালা দিয়ে দেখে স্মৃতির জোনাকিরা দপ দপ করতে করতে নক্ষত্রের মতো সারা আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে। তার বুকের ভেতর কুয়াশার বিন্দু-বিন্দু কণা। বাণী নিজের ভেতরে কাঁদে।

কিছুক্ষণ শূন্য থেকে আবার স্মৃতির ঝাঁপি খোলে। দক্ষ সাপুড়ের মতো বাঁশি বাজায়। ঝাঁপি থেকে মাথা দোলাতে দোলাতে সাপগুলো তার সামনে মন্ত্রমুগ্ধ ফণা তোলে। বাণী আবার শুরু করে– আমার তখন করুণ অবস্থা। একদিকে জীবন; অন্যদিকে ভালবাসাহীনতায় অতনুর ছায়া, অতনুর জন্য মায়া, এক অস্থির আবেগে দিন-রাত্রি-প্রহর সব যেন একাকার। বাঁচার সাধ নেই– আবেগ নেই। পৃথিবীর বিবর্ণ দিনগুলো আমাকে এতো

দুঃখী করে দিতে পারে ভাবতে পারিনি। অতনুকে বহু জায়গায় খুঁজেছি। পাইনি। একদিন বাবা-মা, ভাই দেশের বাড়িতে। বর্ধমানে। এখানে আমি একা। আমি থাকতাম দোতালায়। এমনিতেই শীতকাতুরে। দশটা বাজতে না বাজতেই আমি লেপের তলায়। লেপের ভেতর শরীর ঢেকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রেমচন্দের 'গোদান' পড়ছিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল করিনি। ঘুম ভাঙলো কারও ডাকে। সঙ্গে দরজায় আঘাত। চমকে বিছানা ছাড়ি। নিঃশব্দে দরজায় দাঁড়িয়ে আগন্তুকের পরিচয় জানার চেষ্টা করি। টেবিলের উপর ঘড়ি দেখি– পৌনে একটা। এতো রাতে কে! ভয়ার্ত কণ্ঠে বলি– কে? কে?

– আমি অতনু, দরজা খোলো।

সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। সমগ্র সত্তাজুড়ে অসম্ভব রকমের ঝড়। মনে হলো আমি যেন বালুর স্তূপের ভেতর একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছি।

কাঁপা হাতে দরজা খুলি– তুমি?

অতনু নিজের হাতে দরজা বন্ধ করতে করতে বললো– আমি এখানে দু'চারদিন থাকবো, তোমার কোনো অসুবিধা হবে না তো?

কিছু বললাম না। মনে মনে বললাম– এসে যখন পড়েছো, তখন কিইবা করার আছে। হাজার অসুবিধা থাকলেও, আশ্রয় দিতে হবে। এতোদিন পর এক পলাতক আসামী আশ্রয় চাইছে, তাকে ফিরিয়েই বা দেবো কি করে।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে অতনু বললো– তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকলে আমি চলে যাবো, শুধু ভোর হওয়া পর্যন্ত আমাকে আশ্রয় দাও। পুলিশের তাড়া খেতে খেতে ক্লান্ত। আর পারছি না...। বলতে বলতেই বিছানায় ধপ করে বসলো অতনু।

বললাম– না অসুবিধা নয়, ভাবছি এখানে এলে কি করে!

– কেন?

– দোতলায় উঠলে কিভাবে, সদর দরজায় তো তালা দেয়া।

হাসলো অতনু। মুখে জয়ের হাসি। বললো– একেই বলে মেয়েদের বুদ্ধি, পাঁচিল টপকে চলে এলাম।

অনেক রোগা হয়ে গেছে অতনু। গালভরা দাড়ি। মাথায় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। চোখ কোটরগত। কিন্তু চোখে সেই একই রকমের দীপ্তি।

– আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়াবে।

– এত রাত্রে কি দিই বলো তো, দেখি একটু অপেক্ষা করো–

– তা না হয় করলাম। কিন্তু হবে তো? মাসিমা-মেসোমশাইদের দেখছি না? সব ঘরই তো তালা দেওয়া।

– ওরা বর্ধমানে দেশের বাড়িতে। এক সপ্তাহ পর ফিরবে। স্কুলে পরীক্ষা চলছে বলে আমার যাওয়া হয়নি।

অনেকদিন পর খুব তৃপ্তি করে খেল অতনু। খেতে খেতে বলল– তুমি কী ভেবেছিলে, আমি মরে গেছি?

– ধ্যাৎ, তাই ভাববো কেন? কিন্তু তুমি এভাবে কতদিন পালিয়ে বাঁচবে?

– যতদিন বাঁচা যায়।

– মানে?

– মরবো তো বটেই। জেল-পালানো আসামীর ভাগ্যে পুলিশের গুলি, সেই ভালো। তবে ওই বন্দীত্ব সহ্য হয় না যে। মরতে যদিই হয়, তবে এই সমাজের অনেক কিছু ভেঙে এবং অনেককে মেরে মরব। অতনুর চোখ দুটো হিংস্র বাঘের মতো জল জল করে।

– সবার সঙ্গে এখনও তোমার যোগাযোগ আছে?

– আছে, দু-চারদিন পর আমি জলপাইগুঁড়ি চলে যাব। আমার সব খবর তুমি শিবেনদার হাতে পাবে। আর অভীকদার কাছে পৌঁছে দেব।

– আমি?

– কেন ভয় পাচ্ছো?

– তা পাচ্ছি! অনেক দিন এ পথ থেকে সরে আছি। আবার আমাকে এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন?

কথাটা শুনে অতনু চুপ করে থাকে।

অতনুকে পেয়ে আমার বুকের ভিতর কাঁপন শুরু হয়েছে। ভয় আর উত্তেজনায়। আমি জানতাম না অতনুর কাছাকাছি এলে কেন যে আমার বুকের ভিতর কাঁপন শুরু হয়। মাটির মানুষ অতনু। কখনও আমার দিকে লোভের হাত বাড়াত না। অতনুকে দেখতে দেখতে আমার মনে হত, অতনু বুঝি জেলের মধ্যে বন্দী করে এসেছে তার পুরুষত্ব।

পাঁচদিন থেকে গেল অতনু। সারাদিন ও উপরের ঘরে বন্দী থাকে। সামনের দরজায় তালা দেওয়া। বাইরে থেকে বোঝার উপায় থাকে না, ঘরের ভিতরে কেউ আছে।

সাহস করে অতনুর চিঠিও একদিন শিবেনদার কাছে পৌঁছাই।

আগামীকাল রাত্রে অতনু চলে যাবে। মনটা তেতো হয়ে যায়। এই পাঁচদিনের প্রতি মুহূর্ত কেটেছে ভয়ে আনন্দে। যেন কিছু পূর্ণতায়। বুকের ভিতরে পরস্পর বিরোধী অনুভব– অতনু চলে গেলে যেন আমার মুক্তি আবার থাকলে ভয়, রাজ্যের ভয়। অতনুর শূন্যতা, পেয়ে হারানো– আমাকে গভীর বিষাদে বিমর্ষ করে তুলছিল।

অতনুর কাছাকাছি আসতেই ধরা পড়ে যাই। আশ্চর্য, আমার শরীর-মন, সমগ্র অস্তিত্ব যেন তার কাছে ধরা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। না, কোন অশোভন আচরণ করল না অতনু। শুধু বুকে জড়িয়ে রাখল। ওর দু'হাতের ভিতর আমার মুখ। আমি অস্থির, উত্তেজিত। হু-হু করে কেঁদে ফেলি। অতনু আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলে– বাণী তুমি এমনভাবে আমাকে বাঁচার লোভ দেখিও না। এমনভাবে দুর্বল করো না। কেন আমার ভিতরের ঘুমন্ত বাঘকে খোঁচা দিচ্ছ?

আমি অতনুর মুখ চাপা দিই।

হাতটা সরিয়ে দিয়ে অতনু বলল– বাণী, আমি জানি, মৃত্যু আমার অনিবার্য। মিছামিছি তোমাকে কষ্ট দিয়ে আমার কী লাভ। আমার লোভ লালসার জন্য তোমার জীবনটাই ছারখার হয়ে যাবে। সামান্য দুর্বলতার জন্য তোমাকে কষ্টে রেখে যেতে চাই না। অতনুর চোখে জল। একটু থেমে দু-হাতে আরও আবেগে জড়িয়ে বলল– তুমি পারলে আমাকে ভুলে যেও। অন্য কোথাও সংসার করে সুখে থেকো।

আবেগে নিজের ঠোঁট চেপে ধরে মনে মনে বললাম– এত সহজে যদি সবকিছু ভোলা যেত, তবে কবেই তোমাকে ভুলে যেতে পারতাম; পারলাম কই। প্রসঙ্গ বদলাতে জিজ্ঞাসা করলাম– মাসিমা কোথায়? এই পাঁচদিনে তোমাদের পারিবারিক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

–জানি না! শুনেছি, দূর সম্পর্কে কোন ভাইয়ের কাছে থাকেন।

তখনও অতনুর বুকে লেপটে আছি। যেন একটা শীতল পাথরের বুকে মাথা রেখে শুনছি পাথরের চাপা একরাশ কান্না।

হঠাৎ অতনু আমাকে ছেড়ে জানালার কাছে দাঁড়ায়। চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে। আকাশের বুকে ম্লান চাঁদ আরও ম্লান হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামে। চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে অতনু ধীরে ধীরে বলতে থাকল– ওই চাঁদের মতই আগামীকাল আমার উজ্জ্বল হতে ইচ্ছে করে। বাঁচতে ইচ্ছে করে। মরতে কে চায় বাণী? আমিও চাই না।

আমারও ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, পৃথিবীর অনন্ত সময়ের মধ্যে বেঁচে থাকি। নিজের জীবন দিয়ে যদি এইসব নিপীড়িত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষের পাশাপাশি থাকতে পারতাম। যদি ওদের হাতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে হাসি ফোটাতে পারতাম। তবে ওরা প্রাণ খুলে হাসত। কিন্তু বাণী কে হাসবে? কার মুখে হাসি আছে? এই সমাজের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরেছে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি বাণী, পাগল হয়ে যাচ্ছি। যতদিন সমাজ থেকে মারাত্মক ক্যানসার দূর করতে না পারি, ততদিন বেঁচে থাকতে চাই। মরতে চাই না।

– কেন মরবে অতনু? কেন মরবে। আমিও হাতটা নিজের হাতে তুলে নিই; ওর মুখে দৃঢ়তার সুখ ছুঁয়ে বললাম– অতনু, দেখে নিও– এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মুখে একদিন সূর্য-হাসি ঝরে পড়বে। পঙ্গু মানুষেরাও একদিন শিরদাঁড়া টান টান করে দাঁড়াবে।

– তাই যেন হয় বাণী, তাই যেন হয়।

অতনু গম্ভীর হল। বলল– এই বাঁচার লোভে জেল থেকে পালিয়ে এলাম। ওরা আমাকে পিষে মারতে চায়।

কথাটা শেষ হল না। দরজায় টক টক শব্দ!

ভয়ে চিৎকার করে উঠি– কে?

– পুলিশ! দরজা খুলুন।

– পুলিশ!

ভয়ে কাঠ হয়ে যাই। না, না আমি অতনুকে কিছুতেই পুলিশের হাতে তুলে দেব না। আমার জীবন দিয়ে ওকে রক্ষা করবো। গলায় অসম্ভব দৃঢ়তা রেখে জিজ্ঞাসা করলাম– কি চাই।

– ভণিতা না করে, দরজা খুলুন। আপনি একজন জেল পালানো আসামীকে লুকিয়ে রেখেছেন। আমাদের কাছে সমস্ত খবর আছে। বাধা দিলে আপনাকেও ছাড়ব না।

– এখানে কেউ নেই।

– দরজা খুলুন। দেখি, কে কোথায় আছে।

অতনু শক্ত হাতে জানালার রড বাঁকিয়ে, শাড়ি বেঁধে নিচে নামতে থাকল। যাবার সময় বলল– বাণী যদি বাঁচি দেখা হবে। যদি মরে যাই, আমাকে ক্ষমা করো।

পুলিশ অফিসার ততক্ষণে দরজায় লাথি মারতে শুরু করেছে। একসঙ্গে কয়েক জোড়া লাথি। একসময় দরজা ভেঙে পড়ল। হুড়মুড় করে পুলিশ ঘরে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে থাকে। একজন আমার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে বলল– বল, শালী, অতনু কোথায়? আমি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অতনুকে পালানোর সময় দিয়েই পুলিশকে আটকানোর চেষ্টা করি, অযথা বলি– কে অতনু, আমি ও নামে কাউকে চিনি না।

– চেন না, পাঁচদিন যাকে নিয়ে ফুর্তি মারছ। আজ তাকে চেন না, শিবেন দত্ত এখন আমাদের আন্ডারে। তার কাছ থেকে জানলাম। তুই ছেনালী তাকে আশ্রয় দিয়েছিস।

– ভদ্রভাবে কথা বলুন।

– আরে ব্বাস। তেজ দেখ্ না। জানিস এই তেজ বুটের চাপে ভেঙে দিতে পারি। বল্ অতনু কোথায়?

– জানি না?

– জানি না! বলেই একজন আমার চুলের মুঠি ধরে ফেলে বুট দিয়ে আমার হাত থেঁতলে দিতে থাকে। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠি।

– ভণিতা করে কোন লাভ নেই মিস বাণী। অতনুকে বাঁচাতে পারবি না। এখান থেকে পালিয়ে ও কতদূর

যাবে। সারা বাড়িটা পুলিশ ঘিরে রেখেছে। পালাবার কোন পথ নেই।

পুলিশের কথায় আঁতকে উঠি। অসংলগ্ন মুহূর্তে জানালার পর্দা সরে যেতেই ভাঙা জানালায় চোখ যায় পুলিশের। এবং দেখতে পায় অতনু পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করছে।

পুলিশ অফিসার হুঙ্কার ছাড়েন– সাবাস অতনু সাবাস। বেশ কিছুদিন আমাদের উল্লু বানিয়ে ছেড়েছ আজ আর রেহাই নেই। বলেই নীচে দাঁড়ানো পুলিশদের আদেশ দিলেন– ফায়ার।

অতনু পাঁচিলের উপরে। অমনি পাঁচিলের ওদিক থেকে অন্যান্য পুলিশের কণ্ঠস্বর– কোন লাভ নেই। অতনু বাবু, ধরা দিন। তা না হলে কুকুরের মতন গুলি খেয়ে মরতে হবে।

দ্বিতীয়বার অতনু শূন্যে ঝাঁপ দেবার আগেই একসঙ্গে কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ হল।

অতনু টলতে টলতে ছুটছে। তার রক্তাক্ত পা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে রাস্তায়। অতনু ছুটছে বাঁচার প্রত্যাশায় ছুটছে, তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে যাচ্ছে কয়েকটি গুলি। অতনু আর্তনাদ করতে করতে লুটিয়ে পড়ছে।

রাস্তার দু'ধারে বাড়ির দরজা-জানালা এক এক করে খুলে যাচ্ছে। বিস্ময়ে দেখছে সবাই শিক্ষিকা বাণী দেবীর বাড়িতে গুলি চলছে। এই অভাবনীয় ঘটনা যে ঘটতে পারে তারা ভাবতে পারেনি।

সেদিন আমিও অ্যারেস্ট হলাম। সমাজবিরোধী, জেলফেরত আসামীকে আশ্রয় দেবার অপরাধে। এই ঘটনার পরও স্কুলের বড়দির স্নেহধন্য হয়েছিলাম। তিনি আমাকে বাঁচানোর জন্যে ছুটে বেরিয়েছিলেন। উকিল, কোর্ট; বহু পরিশ্রমে অর্থ দিয়ে আমাকে মুক্ত করেছিলেন। ওনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না।

বাণী কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় থামে। একসময় আবছা আয়না থেকে মুখ সরিয়ে আহত পাখির স্বরে বলে– অতনু হারিয়ে গেছে।

দিবাকর পাথর হয়ে বসে থাকে।

সারা শরীর ঘামে ডুবে যাচ্ছে বাণীর। জানালায় মাথা রেখে হু-হু করে কাঁদছে সে। নীরা ও-ঘর থেকে এ-ঘরে এসে বাণীকে এভাবে কাঁদতে দেখে কষ্ট পায়। মাথায় হাত রেখে ডাকে– মা, ও মা, তুমি অমন করছ কেন? কী হয়েছে তোমার?

বাণী মুখ তোলে– কিছু নয় রে। তুহিন ফিরেছে?

– না, না।

– এখন কটা বাজল?

– দশটা দশ।

– দশটা, এখনও এল না তুহিন! বড় মাসির বাড়িতে ফোন করো। জয়ন্ত, সুজিত, করিম ওদের বাড়িতেও ফোন করো।

– মা, যেখানে পড়তে যায়। মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে ফোন করব?

– করো।

নীরা ডায়াল করার আগেই দরজায় বেল বেজে উঠল।

বেল বাজতে থাকল তিরিয়ে তিরিয়ে।

নীরা ফোন রেখে দরজার দিকে ছুটে গেল। উৎসুক বাণী দেখল তুহিন ঘরে ঢুকছে। বিমর্ষ তার চেহারা।

তুহিনকে ফিরতে দেখে বাণীর ঘোর কাটে। বুকের ভেতরে চেপে থাকা পাথর সরে যায়। খুব স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। ইচ্ছে করে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে। পারল না। তুহিনের দিকে পা বাড়াতে, তুহিন মুখ ঘুরিয়ে

বাথরুমে ঢুকে গেল।

॥ চার ॥

তুহিন জানত। এত দেরীতে ফেরার জন্য বাড়িতে দু'জন তার জন্য উৎকণ্ঠায় থাকবে। ঘর-বার হবে। একজন জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে কিংবা কাঁদবে, অন্যজন ফোনের পর ফোন করবে। আশঙ্কায় বাতাসে ভারী হয়ে উঠবে ঘর। আজ আর কেউ দেরী করে ফেরার জন্য কৈফিয়ত চাইবে না। এ সব ভেবেই ওদের কষ্ট দেবার জন্যই দেরী করে ফিরল সে।

বাকরুদ্ধ প্রতিমার মতই ছেলের বাড়ি ফেরা দেখল বাণী। এসব নিয়ে প্রশ্ন করল না। যথারীতি ভাত সাজানো টেবিলে। ছেলেকে ডাকল। মেয়েকে ডাকল। নিজে বসল। অন্যদিন খেতে খেতে অন্য কথাবার্তা হত। আজ আর হল না। তুহিন কোন ভনিতা না করেই ভাত খেল। পেট ভরেই ভাত খেল। উদ্দেশ্য একটাই, বাণী যেন তাকে অনুরোধ করার সুযোগ না পায়। লক্ষ্মী ছেলের মতই ব্যবহার করল সে।

তুহিনকে নিশ্চুপ ও বাধ্য ছেলের মত আচরণ করতে দেখে বাণীও কিছু বলল না। খাওয়া শেষ করে যে যার বিছানায় গেল।

বিছানায় শুয়ে তুহিনের ঘুম এল না। কিছুক্ষণ ছটফট করল। বাণী-মা'র জন্য দুঃখবোধে কাতর হল। পরক্ষণেই প্রতিহিংসায় সে উষ্ণ হয়ে উঠল। বাণী যে তাকে গভীরভাবে স্নেহ করে তা জানে তুহিন অথচ একজন অভাগী মায়ের মুখ, তার প্রতি দুর্ব্যবহার ও অনীহা, অবজ্ঞার কথা মনে হলে সে গভীরভাবে বিষণ্ন হয়ে ওঠে। তখন বাণী-মা'র জন্য তার বুকের ভিতর কোন মমতা, কোন করুণা, কোন কিছুই থাকে না। এমনটি হয়ে ওঠার কোন কারণ জানে না তুহিন। যে মাকে সে কোনদিন চোখেই দেখেনি, তার জন্য এত দরদ কিসের। একেই কি বলে রক্তের সম্পর্ক।

তুহিন জানে, পৃথিবীতে বাণীর নিজের বলতে কেউ নেই। সে আর নীরাই তার জীবনের সব। মা হিসাবে এ বাড়িতে আসার পর তাঁর কোন সন্তানও আসেনি। সুতরাং প্রতিহিংসা বা দ্বন্দ্বের কোন কারণ নেই; তবুও রাগ হয়। ওকে কষ্ট দিয়ে নিজেও কষ্ট পায়, কিন্তু যখন মনে পড়ে ওর জন্য তার মাকে বাবা ডিভোর্স দিয়েছে, তখনই শ্রদ্ধা-ভক্তি কর্পূরের মতো উবে যায়। সবই অনুভব করে তুহিন। শুধু জানে না, কেন তার ভিতরে এত কষ্ট।

স্বপ্ন আসে, রোজ স্বপ্ন ভাঙে, শূন্য হয়ে ওঠে তুহিন। একটা আবছা অচেনা জগৎ তার ছন্দময় জীবনকে গভীর বিষাদে ডুবিয়ে দেয়।

কিছু সময় বিছানায় অস্থিরতার পর তার দু-চোখ ভরে ঘুম আসে। ঘুমিয়ে সে অদ্ভুত এক সময়ের ভিতর থেকে সময়ের গভীরে চলে যেতে থাকে। তার চেতনার ভিতরে গ্রাম বাংলার নির্জনে মাটির ছোট্ট দোতলা বাড়ি। চারদিকে বাঁশ আর সুপারির ঝাড়। নিঃস্তব্ধ পরিবেশ। দোতলায় পর পর দুটো ঘর। ঘরের মাঝখানে মেহগনি খাট। দু'পাশে আলমারি ভর্তি বই। বিছানায় সাদা ধবধবে চাদর বিছানো। খাটের উপর একটি বাচ্চা ঘুমোচ্ছে অকাতরে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদের গা বেয়ে গড়িয়ে নামা জ্যোৎস্না পৃথিবীর বুকে অদ্ভুত মাদকতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই জ্যোৎস্নার একটা অংশ ছড়িয়ে আছে বিছানায়।

সাদা ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠছে শিশুর মুখ। দূরে খালপাড়ে কেউ যেন জল ছেঁচা মেশিন চালিয়েছে। তার ঢক ঢক শব্দ সারা মাঠ ফুঁড়ে কানে এসে ঠেকছে। খোলা জানালা দিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে বসে আছে একজন রমণী। সাজ-সজ্জায় সজ্জিত সে।

দূরে মেশিনের ঢক ঢক শব্দ থেমে যেতেই রমণী উঠে বসে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। তার সারা শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ চাঁদটা একটু নিচে নেমে মেঘের আড়াল হল যেন। অমনি ঘর ভর্তি অন্ধকার।

তার কিছুক্ষণ পর একটা পদশব্দ ধীরে ধীরে এসে থামে দোতলার নীচে। পদশব্দ তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওঠে উপরে। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থেকে দরজায় মৃদু করাঘাত।

খুট করে দরজা খুলে গেল। মুহূর্তে ঘরের ভিতর দুটো ছায়ায় এক হওয়ার দৃশ্য। মাঝে মাঝে মেঝেয় পেতে রাখা নকশি কাঁথার বিছানায় দুই অশরীরী ছায়ার যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।

হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ছোট ছেলেটি। মেঝে থেকে রমণী উঠে তার পাশে বসে গায়ে হাত বোলাতে থাকে। আবার ঘুমে ঢলে পড়ে ছেলেটি।

রমণীর আয়ত দীর্ঘ চোখের ভিতরে এক অদ্ভুত গন্ধ পেল তুহিন। হরিণীর মতো চাউনির ভিতরে তার জন্ম গন্ধ ভেসে এল।

বড়ো চঞ্চল হল তুহিন। বুকের ভিতরটা আকুল করে উঠল। পুতুল পুতুল চেহারার রমণীকে তার ভীষণ ভালো লেগে গেল। তুহিন দু-চোখ ভরে দেখল রমণীকে।

রমণীটিও যেন দেখতে পেল তুহিনকে। কিছুটা বিস্ময় তার চোখে। হঠাৎ তুহিন মা বলে অস্পষ্ট শব্দ করতেই দেবী দেবীভাব রমণীটি ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরল তুহিনকে।

ঘুম পাতলা হলে তুহিন বুঝতে পারল, এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের জগৎটা ভাঙতে চাইল না তুহিন। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে স্বপ্নের প্রতিটি ভাবনার ভিতর তার ডুবে যেতে ইচ্ছে করল। ডুবে যেতে চাইল সে।

বাইরে রাতপাখির চিৎকার। তুহিন বিছানায় উঠে বসে। স্বপ্নটা তার কাছে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তুহিন বুঝল, তার মনের ভিতর কোথাও একটা সুন্দর জগৎ আছে। যে জগৎটা তার খুব চেনা চেনা, অথচ কখনও নিবিড় করে ধরতে পারছে না সে।

তুহিন বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। তার স্বপ্ন ছিন্ন জগতের ভিতর থেকে খুঁজে পেতে চায় স্বপ্নের মহিমা। হৃদয়ের তীব্র দহনে সে কেঁদে ওঠে। বিষণ্ন হয়ে যায়। স্বপ্নের প্রতিটি মুহূর্ত জোড়া দিতে চেষ্টা করে। জোড়া দিয়ে গড়ে তুলতে চায় স্বপ্নের শরীর। পারে না। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা শুরু হয় তার। বুকের গভীর থেকে তুমুল আর্তনাদ বের হয়ে আসে– মা, ও মা!

ঘুম ঘোর চোখ তুলে তুহিন দেখে, একটা আবছা নারী মূর্তি তার বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে। তুহিন জোর করে স্বপ্নের স্মৃতিটা ছুঁতে চাইল।

তখনই উষ্ণ চোখের জল তার দু-গালে টপটপ করে ঝরতে থাকল। চমকে উঠল তুহিন। দেখল– বাণী-মা দাঁড়িয়ে আছে তার বিছানার কাছে। তার দু-চোখে জল। তুহিন অবাক হল না। সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাত বাড়িয়ে বাণীকে ছুঁয়ে থাকল।

মানময়ী গার্লস স্কুলের বাগানে যেন তাড়াতাড়ি বসন্ত এসেছে। ওইখানে প্রতিদিন আড্ডা অভিভাবকদের।

স্কুল ছুটির পর বাইরে বেরিয়ে বাণী দেখল, মেয়েদের নিয়ে যেতে অভিভাবকদের অনেকে এসেছেন। তাঁরা বাগানের ঘাসে পা ডুবিয়ে গল্প করছেন। এখানে-ওখানে এক একটা জটলা। গল্প আর কী। স্রেফ আড্ডা। আড্ডার বিষয়বস্তু বলতে সেই একই আলোচনা– আমার ছেলে অমুক, ওর ছেলে তমুক। স্বামীদের প্রভাব প্রতিপত্তি গুণগান কিংবা বদনাম। কেউ কারও কাছে হার মানে না।

বাণী শুনে আসছে দীর্ঘদিন। শুনতে শুনতে কান সওয়া হয়ে গেছে সব।

এখন তাকে নিয়ে যে আলোচনা হয় তা সে অনুমান করে। উপস্থিত সবাই তার দিকে ঘুরে দেখছে। সে হেঁটে গেল। মুখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে দেখল– গেটের কাছে দিবাকর, সঙ্গে তুহিন।

দিবাকরকে দেখে সবাই চুপ। পারতপক্ষে দিবাকর বাগানে ঢোকে না। ছুটি হতে দেরী থাকলে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইদানীং যেন দিবাকরের সঙ্গে ওর অলিখিত চুক্তি হয়েছে। দিবাকর এলেই বাণী স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে কখনও কফি হাউস, কখনও পুঁটিরাম, কখনও বাণীদের বাড়ি, কখনও দিবাকরের দোকানে, কী

বাড়িতে গিয়ে আড্ডা। যেদিন দিবাকর আসতে পারে না, ফোন করে জানিয়ে দেয়। বাণী নিজেই নীরার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাজির হয় পূর্ণ প্রকাশনীতে। দিবাকর না থাকলে দোকানে বসে। খদ্দের সামলায়। বইপত্তর দেয়। কখনও বইয়ের প্রুফ দেখে। এক সময় মহুয়া নামে একটি সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল বাণী। প্রেসের আওয়াজ, নতুন বই, ছাপার কাজ তার খুবই চেনা।

ইদানীং দোকানে বসে বাণীর মনে হয়েছে ব্যবসা যেন চলছে না। কেমন যেন শ্রীহীন অবস্থা! কেমন যেন দেউলিপনা। মাত্র একজন কর্মচারী সারাদিন বসে বসে মাছি তাড়ায়।

সন্দেহের বশে দিবাকরকে বহুবার জিজ্ঞেস করেছে। কোন সদুত্তর পায়নি। মুখ দেখে অনুমান করেছে– কোথাও যেন অসহায়তা লুকোচ্ছে মানুষটা। বুঝতে পারে– ওর স্ত্রী নিজে মরেনি, ওকেও মেরে গেছে।

দোকানের পুরনো কর্মচারী সরকার বাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করল বাণী- আচ্ছা সরকার বাবু দোকানে কোন বইপত্তর নেই কেন? নতুন কোন বই প্রকাশ হয়নি?

সরকার বাবু, কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল– কী বলব মা জননী, সেসব অনেক কথা। পুরনো কর্মী বলে চলে যেতে পারিনি। আশায় থাকি যদি সময় ফেরে।

– কেন?

– কেন আবার, মাঝে মাঝে আশ্চর্য হই, দিবাকরের মতো ছেলেও এমন ভুল করে। অথচ এই ব্যবসা কী কঠোর পরিশ্রম করে দাঁড় করিয়েছিল। রাত নেই, দিন নেই, খাওয়া নেই, কাজ আর কাজ। প্রথম কাজ করত প্রুফ রিডারের। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে একটা ছড়ার বই প্রকাশ করল। তারপর দোকানঘর ভাড়া নেওয়া। ধাপে ধাপে একটা মই বেয়ে উপরে উঠতে থাকল দিবাকর। আমি-ই প্রথম থেকে ওর সঙ্গে আছি। কী পরিশ্রম করতে পারে ছেলেটি– অনেকদিন প্রেসে বসেই কাটিয়ে দিয়েছে। বই ছাপা-বাঁধানো, বইগুলো স্কুলে স্কুলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা তার জন্য এজেন্ট নিয়োগ করা, যারা স্কুলে পাঠ্য হিসাবে সিলেকশান করবেন, সেই সব মাস্টারদের সন্তুষ্ট করা– সবই নিজেই সামলাত দিবাকর। কয়েক বছরের মধ্যে ব্যবসা ফেঁপেফুলে উঠল। কিন্তু ভাগ্য ওকে সহায় দিল না। ফুটো বেলুনের মতন চুপসে গেল ব্যবসা।

– কেন? হঠাৎ কী এমন হল?

– সে অনেক কথা মা, অনেক কথা। সরকারবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

– বলুন, থামলেন কেন?

– না, থাক। দিবাকর শুনলে কষ্ট পাবে।

– আমি না শুনলে আরও কষ্ট পাবো।

– মা জননী, সে বড়ো করুণ কাহিনী। একজন বাবা আপন মেয়ে ও জামাইয়ের এত ক্ষতি করতে পারে, তা ভাবা যায় না।

– কেন? কী করেছেন?

– দিবাকরের সঙ্গে বেইমানি। দিবাকরকে ধানি জমি কিনে দেবার নাম করে প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে যায়। দিবাকরও সরল বিশ্বাসে এই ব্যবসার টাকা ওখানে দেয়। কিন্তু ভদ্রলোক জমি কেনে নিজের নামে।

– দিবাকর কিছু বলেনি?

– কী আর বলবে? শ্বশুর মশাইকে সরল বিশ্বাসে টাকাটা দিয়েছিল। তার কোন প্রমাণ ছিল না। সেই থেকে দোকানের এই হাল। সেই সময় তুমি যদি দিবাকরের চেহারা দেখতে। উদভ্রান্ত, পাগলের মতো। দুটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসেছে কলকাতায়। থাকার জায়গা নেই। কর্মচারীদের মাইনে দিতে পারে না। তারা কাজ ছেড়ে দেয়। আমি ওদের আমার ফ্লাটে আশ্রয় দিই! অবশ্য ভাড়া দেয়। ওখানেই আছে।

বাণীর কৌতূহল বাড়ল– ঘটনার পরবর্তী পর্যায় না শুনে অনুমান করেই জিজ্ঞেস করল– তা তোমাদের বৌদিমণি মারা গেল কিসে?

– মারা গেছে? কে বলল জননী? ডাহা মিথ্যে কথা অমন কুলটা মেয়েরা এত সহজে মরে না। মরবে না। মরবে অনেক কষ্ট পেয়ে।

– মরেনি তবে কোথায়?

– পালিয়েছে!

– পালিয়েছে! বিস্ময়ে উচ্চারণ করে বাণী।

– দিবাকর দেশের বাড়িতে দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিল। সেই কালনাগের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তারপর তার বাবার এই আচরণ– বেইমানি। সবই যেন ছকবেঁধে দিবাকরকে নিঃশেষ করে দেবার চক্রান্ত।

– এমন নিষ্পাপ বাচ্চা, এমন অমায়িক স্বামী ফেলে কেউ পালাতে পারে! এসব বিশ্বাস করতে পারছি না।

– মা, এ-পৃথিবীতে সবই হয়। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মানুষ কী না করতে পারে?

বাণীর চোখ ছল ছল করে। দিবাকর বোধহয় লজ্জায়, ঘৃণায় স্ত্রী চরিত্রহীনতার কথা বলতে চায়নি। পারেনি। বাণী মনে করতে চেষ্টা করল। দিবাকর তুহিনদের 'মা' নেই বলেছে, কিন্তু মরে গেছে একবারও বলেনি।

বাণীর চোখে জল দেখে সরকার বাবু হঠাৎ বলল– একটা কথা বলব মা, কিছু যদি ...।

– না, না, বলুন। মনে করার কিছুই নেই।

– তোমার চোখের জল দেখে বুঝেছি দিবাকরের জন্য তোমার বুকে সামান্যতম হলেও করুণা আছে। যদি সম্ভব হয় দিবাকরের চোখের জল মুছে দিও মা। ছেলেটা বড় দুঃখী, অসহায়। একটু থেমে বলল– জান মা, তুমি আসতে, ওর চোখে মুখে সাত-আট বছরের হারানো হাসি ফিরে আসতে দেখেছি। যদি পারো মা । ওকে বাঁচার আলো দেখিও। বড় ভালো ছেলে দিবাকর। বড়ো ভালো ছেলে। ওকে যদি নিজের করে নাও, তোমার কোন অমর্যাদা হবে না।

দিবাকরের জন্য বাণীর বুকের ভিতর আরও একটু শূন্যস্থান তৈরী হয়। বাণী বুঝতে পারে না, এই শূন্যস্থান ভালোবাসার না সহমর্মিতার, না মনোবেদনার। যাই হোক দিবাকরের জন্য বুকের ভিতর একটা ফুল ফুটছে, তার সুগন্ধ টের পায় সে।

বাণী বসে থাকতে থাকতে উঠে পড়ে। হাতে ব্যাগ গুছিয়ে বলল– দিবাকর বাবু তো এখনও এল না। আমার কাজ আছে আজ চলি।

– যাবে, যাও– তবে মা, তোমার সঙ্গে এত কথা হল; এ কথা যেন দিবাকর না জানে।

– না, ঠিক আছে।

সেদিন থেকে দিবাকরের সবটুকু জানার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। আজ ঠিকই করেছিল, দিবাকরকে তার ডিভোর্স স্ত্রীর কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করবে। যদিও এটা তার ব্যক্তিগত সমস্যা, তবুও ওর নিজের মুখ থেকে শোনাই ভালো।

এখন গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বাণী এগিয়ে গেল।

বাণীকে আসতে দেখে দিবাকর বলল, ওরা কেমন করে দেখছে দেখ। নিশ্চয় কিছু ভাবছে। দিবাকর কঠোর চোখে ওই মহিলাদের দিকে দেখে যেন কিছু বলতে চায়।

বাণী কাছে গিয়ে দিবাকরের হাত ধরে– ওরা সত্যি যদি কিছু ভেবে থাকে তাতে অন্যায় কোথায়? ওরা তো ভুল কিছু ভাবছে না?

– কি ভাবছে?

– এই আমাদের মেলামেশা, ভালোবাসা।

শুনে দিবাকর বসন্ত মেঘ হয়ে যায়। শরীরজুড়ে কয়েকগুচ্ছ মেঘের আস্তরণ। বুঝতে পারে সারা শরীরের প্রতি কোষে অজস্র ফুল ফুটছে, তার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

দিবাকর দেখে বাণীর চোখের গভীর থেকে গড়িয়ে নামছে উজ্জ্বল আলো। সেই আলোতে স্নান করছে সে। আর তার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কী তীব্রভাবে আলোড়ন তুলছে। স্থির থাকতে পারছে না। আচ্ছন্ন দিবাকর ছুটতে থাকে।

ছুটতে ছুটতে পেরিয়ে যায় ফাঁসিতলার মাঠ, বিল-পুকুর ভর্তি জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না গোলা জলে এক জল-পরীর স্নান। ছায়া ছায়া খেলা।

তারপরই দিবাকরের বুকের ভিতর থেকে হঠাৎ ভেসে উঠল স্ত্রী সরমার মুখ। এমনি তার আলোময় মুখ ম্লান হয়ে গেল অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ রেখে আরও কিছুটা হেঁটে যায় দিবাকর। বাণী দেখে অবাক হয় এমন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে দিবাকরের মুখ। নাকের পাটা তির তির করে কাঁপছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কী যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফেটে পড়তে চাইছে দিবাকর। দেখে খুব-ই ভয় পায় বাণী।

চলতে চলতে দিবাকরকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল– কি হল দিবাকর?

– কিছু নয়।

– অমন বিমর্ষ কেন?

– কই না তো?

– আমার কথায় রাগ করলে?

– রাগ করব কেন, তোমাদের কথায় বড় ভয় পাই।

– ভয়? কেন? কিসের ভয়।

– জীবন ভেঙে দেবার ভয়, ভেঙে যাবার ভয়।

– আমাকে বিশ্বাস হয় না?

– আমাকে অমন করে লোভী করো না বাণী, আমি বাঁচতে চাই। এই নীরা-তুহিনের ভিতর বেঁচে থাকতে চাই। যে সংযমের প্রাচীর তুলেছি, তা এমনভাবে লোভ দেখিয়ে গুঁড়িয়ে দিও না।

– বেঁচে থাকার নামই তো লোভ। লোভের ভিতরই থাকে বেঁচে থাকার নেশা, নেশার মধ্যে থাকে স্বপ্ন। স্বপ্নহীন জীবন, কখনও জীবন পায় না দিবাকর।

– জানি, সবই জানি কিন্তু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে না, তাদের ভেঙে যাবার ভয় থাকে গভীর। আমার বড়ো ভয় করে। তুমি আমাকে লোভী করো না, প্লিজ।

– বাণী বুঝতে পারে দিবাকরের বুকের ক্ষত এখনও মুছে যায়নি। বোবা চোখে দেখে। মনে মনে ভাবে, আমি কী পারব দিবাকর, তোমার মনের অসুখ সারিয়ে তুলতে। ঈশ্বরের উদ্দেশে দু'হাত প্রার্থনা করে– আমাকে শক্তি দিও প্রভু।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে কফি হাউসের কাছাকাছি চলে আসে। বাণীর ইচ্ছে করছিল কিছুক্ষণ কফি হাউসে কাটিয়ে যায়। কিন্তু দিবাকর তেমন কোন আগ্রহ দেখাল না বলে বাণী চুপ করে থাকল।

আরও কিছুটা এগিয়ে বাণী বলল– একটা কথা জিজ্ঞেস করব যদি কিছু না মনে কর।

– বল।

– দোকানের অমন অবস্থা কেন? সিজন তো এসে গেল। নতুন বই বের হবে না?

দিবাকর চুপ করে থাকল।

– কথা বলছ না যে?

– কিছুটা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য দোকানটা চালাতে পারছি না। একটা গ্রামার বই শেষ করেও সিজনে বার করতে পারলাম না।

– আমি যদি কিছু দিই, নেবে? বন্ধু হয়ে বন্ধুকে সাহায্য করা, ধার হিসাবেই নেবে। সময়ে শোধ করে দেবে।

উত্তর দেওয়ার আগেই হাত চেপে ধরে বলল– না করো না দিবাকর, তোমার মতো উজ্জ্বল প্রকাশক এভাবে হেরে যেতে পারে না। আমি জানি তুমি ঠিক মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। জীবন ঘটনার চাপে দুমড়ে মুচড়ে যাবে, এটা নতুন কথা নয়। নতুন কথা হল, শত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সমস্ত ঘটনাকে জয় করে, যারা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

দিবাকর আকাশে মুখ তুলে চাইল। দেখল, বহু উঁচু থেকে একটি পাখি শাঁ শাঁ করে নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। তার ডানা থেকে একটি পালক ছিন্ন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নামছে পৃথিবীর দিকে, দিবাকর জানে ঐ পালক পৃথিবীর কোথাও না কোথাও কোনভাবে স্থান পাবে, সৌন্দর্য ছড়াবে।

দিবাকর নিজেকে সংবরণ করল।

বাণীর খুব ইচ্ছে করছিল; ওকে জিজ্ঞেস করে, তুহিনের মায়ের কথা, ওর পূর্ব জীবনের ঘটনা।

দিবাকরের মুখের দিকে চেয়ে নির্বাক হল বাণী।

মুখটা বড়ো বিষণ্ন, কাতর।

দিবাকর নীরার হাত ধরে চলে যেতেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে ফেলে বাণী।

সবাই একটা না একটা জায়গায় পৌঁছতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। না পারলে ফিরে আসে। অনেকে আসে অনেকে আসতে পারে না। অতৃপ্তির মনোকষ্টে হারিয়ে যায়। দিবাকরের জন্য বাণীর বুকের ভিতর যে স্বপ্ন-ভূমি তৈরী হয়েছিল, সেই জমি এক দৌড়ে পার হতে গিয়েও পারল না সে। কিছুটা গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল। ফেরার জন্য মুখ ঘুরিয়েও ফিরতে পারল না। পথের শূন্যতা তাকে গ্রাস করে নিল।

বছর দেড়েকের ব্যবধানে দিবাকর নামক এক দুঃখী নদীর মায়াবী স্রোতে ভেসে এসেছে এতদূর। সে জানে উজান ঠেলে ফিরতে চাইলেও ফিরতে পারবে না। তুহিন-নীরার অসহায়ত্ব তাকে স্পর্শ করে। এক গভীর অসুখে অসুখী হয়ে ওঠে সে।

পূর্ণ প্রকাশনীর ম্যানেজার সরকার বাবুর কাছ থেকে দিবাকরের স্ত্রী সরমার বেঁচে থাকার কথা শুনে তার বুকের ভিতরে জেগে ওঠা স্বপ্ন যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। অনেক কথাই মনে আসে। একজন নারীর দ্বিচারিতা তাকে ছুঁয়ে যায়। তার দুর্ভাগ্যের জন্য কষ্ট পায় সে।

দিবাকরের জীবন থেকে ফেরার কথা ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারে, ফিরে আসা তার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। একটা সুখ তাকে জড়ায়, ঈর্ষা তাকে তাড়া করে। নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়ার পর স্থির করে, দিবাকরকে কোন মানসিক আঘাত দেবার আগে তার-ই মুখ থেকে সরমার সম্পর্কে সব জেনে নেওয়া দরকার। তা না হলে নিজের কাছে মুক্তি পাবে না কোনদিন।

দু'দিন আকাশ-পাতাল ভেবে অবশেষে দিবাকরকে ফোনে চৌরঙ্গীর নিউ ক্যাথে রেস্টুরেন্টে আসতে বলল।

বাণী আধ ঘণ্টার মধ্যে নিউ ক্যাথে পৌঁছে দেখল, দিবাকর এসে গেছে। দোতলার এসি রুমে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। ব্যস্ততম চৌরঙ্গী অঞ্চলের এই বারটির মনোরম পরিবেশ দিবাকরের খুবই পছন্দ। সে কখনোসখনো মদ্য পান করে। সুস্বাদু খাবারের জন্য প্রায় এখানে আসে। কোন হৈ-হুল্লোড় নেই। ঝুট-ঝামেলা নেই পরিবার পরিজন নিয়ে নির্ভয়ে বসে খাবার উপযুক্ত জায়গা।

বারবার আসার জন্য ওরা দু'জনেই ওয়েটারদের খুবই পরিচিত। রবিবারের বিকেল। ঘরটি বেশ ফাঁকাই রয়েছে।

বাণীকে দেখে দিবাকর হাসল– এক সপ্তাহ পরে মনে পড়ল? কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

– না, ঘরেই ছিলাম।

– তবে, কোন খোঁজখবর নেই কেন?

– পরীক্ষার খাতা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

– ওঃ!

– ওরা কোথায়?

– ওদের এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে এলাম। ফেরার পথে নিয়ে যাবো।

ওয়েটার এসে দাঁড়াতেই বাণীর দিকে চেয়ে দিবাকর বলল– কী খাবে বল!

– তোমার যা পছন্দ।

– চিকেন স্যুপ, স্পেশাল ফ্রাইড রাইস, প্রণ পোকাড়া, আর এক প্লেট ফ্রাই চিলি চিকের বোনলেস। এক পেগ পিটার স্কট এক পেগ জিন। ওয়েটার চলে গেলে বাণীর মুখের দিকে চেয়ে দিবাকর নিচুস্বরে বলল– তোমাকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। শরীর খারাপ নাকি?

– আমি ঠিকই আছি। কয়েকদিনের অদর্শনে বোধহয় তোমার চোখ ভুল দেখছে।

– হতে পারে।

হাসল দুজনেই। দিবাকর বাণীর হাতটা নিজের হাতে আলতো ছুঁয়ে থাকে এখানে যতবার এসেছে প্রত্যেকবারেই তুহিন কিংবা নীরা সঙ্গে এসেছে। একা এভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার সুযোগ হয়নি। তাছাড়া বাণীর মনের সুপ্ত আলোকে স্নান করতে চাইলেও করতে পারেনি। কোথাও একটা সূক্ষ্ম পর্দা রয়েছে দু'জনের মাঝে। দিবাকর মাঝে মাঝে পর্দাটাকে সরিয়ে তার দিগন্তভরা জ্যোৎস্না ছুঁতে চেষ্টা করে, পারে না। ভয় হয়! দু-ই অসহায় শিশুর নির্ভরতার আশ্রয় যদি কোন কারণে নিভে যায়। বাণীও সহজ হয়ে দিবাকরের ভিতরের জ্যোৎস্না স্পর্শ করেনি। শুধু একটা ঘোরের ভিতর চলমান জীবনের প্রতি মুহূর্তকে ছুঁয়ে থাকে। বাণীকে বিমর্ষ দেখে, তার বুকের ভিতরে ঢেউ ভাঙার গর্জন একমাত্র সেই টের পেল। বাণী আন্দাজ করতে পারল না।

বাণী হাতটা সরাল না। অন্তরঙ্গ দৃষ্টি দিয়ে দিবাকরকে দেখতে দেখতে তার চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল না জল, তার শীতল স্পর্শ নিয়ে ধরা গলায় বলল– কী হল! কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?

– কিছু নয়!

– না, কিছু তো হয়েছে! কেউ কিছু বলেছে?

আরও নিবিড় করে দিবাকরের হাত জড়িয়ে নিয়ে বাণী বলল– নিজের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে পারছি না, তুমি পুরুষ হয়ে বোঝ না একটা নারীর মন। দীর্ঘ দেড় বছরেরও বেশী হল, একটা দিনও আমাকে ছুঁতে চেষ্টা করলে না, বুঝলে না। আমি মেয়ে হয়ে নিজের কথা বলি কী করে!

– ভুল বললে, মন বুঝতে না পারার মতো জড় আমি নয়। তবে বড় ভয় করে, ভীষণ ভয় করে। নিজের

জীবনের ক্ষত ব্যথা দেয়, তাই হয়ত সহজ হতে পারিনি। তবে এটুকু বলতে পারি, তোমার সাহায্যে-সহযোগিতা, তোমার মতো বন্ধু ছাড়া আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। সেই জন্যে তোমার কাছে বেশী কিছু চাইতে ভয় পাই। বেশি কিছু চাইতে গিয়ে এটুকু যদি হারাই।

– এ তোমার মিথ্যে ভয়। শোন, একটা অভিজ্ঞতাই শেষ অভিজ্ঞতা নয়। পৃথিবীর সব মেয়েই খারাপ নয়।

– তা মানি, তবু কিন্তু থেকে যায়।

বাণীর মনে হল, দিবাকর মনের অসুখে ভুগছে। নিজের কামনা দিয়ে ওকে না ভরালে হবে না। বলল, শোন তোমাকে আমি ভালবাসি। তোমাকে চাই।

খাবার এসে গেছে। স্যুপ খেতে খেতে দিবাকর বলল- এ কথা বলার জন্যই এই সাতদিন ঘরবন্দী হয়েছিলে?

– না, আসলে তোমাকে ডেকেছিলাম একটা কথা সরাসরি জিজ্ঞেস করব বলে।

– আরও কথা আছে! বলেই ফেল। আসামী তোমার সামনে।

– কিছু মনে করবে না তো?

– তোমার কোন কথাতেই আমি ক্ষুণ্ন হব না।

– তোমার স্ত্রী বেঁচে আছেন?

বিবর্ণ হয়ে গেল দিবাকরের মুখ। হাতের চামচ স্যুপের বাটিতে থেমে গেল।

বাণী বলল, কী হল? চুপ করে গেলে যে?

বাণী এসব জিজ্ঞেস করছ? সে অতীত আমি ভুলে গেছি।

– কিন্তু আমার কথা ভাবো, আমি একটা নারী। তোমার সুখে-দুঃখে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে যে জীবন জড়াতে চাইছি, তার যদি কোন অন্তরায় থাকে আগে তাকে কী সরানো ভালো নয়? তোমাকে এর আগে তোমার স্ত্রী সরমা দেবীর কথা যতই জিজ্ঞেস করেছি, তুমি এড়িয়ে গেছ, স্পষ্ট করে কখনও বলোনি। আজ যখন জেনেছি, ও বেঁচে আছে, তখন সব কথা বলতেই হবে।

নির্বাক পাথরপ্রতিম সামান্যক্ষণ দিবাকর। তারপর অন্যস্বরে বলল– হ্যাঁ, যা জেনেছ তা সত্যি, সরমা বেঁচে আছে। ছেলেমেয়ের মন থেকে মায়ের স্মৃতি মুছে দেব বলেই ওদের মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম।

– কিন্তু কতদিন মিথ্যা ঢেকে রাখা যায়? তুহিন-নীরা বড় হয়ে যখন আসল সত্য জানতে পারবে, তখন তোমার অবস্থার কথা ভেবে দেখেছ কী?

– বর্তমান নিয়ে ভেবেছি, ভবিষ্যৎ অত ভেবে দেখিনি।

– জীবনটা এত সহজ নয় দিবাকর। সময় কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। তা, সরমা এখন কোথায়?

– সম্ভবত বনশ্রী গ্রামে। তার বাপের বাড়িতে।

– সম্ভবত কেন? তোমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই?

– না।

– তোমাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে?

– হ্যাঁ।

বাণী দিবাকরের দুঃখের শরীর স্পর্শ করে শুধাল– কী এমন ঘটেছিল যে সম্পর্কে এমন চিড় ধরল?

– সে অনেক কথা; ওসব শুনে তোমার কী লাভ বলো।

– কিন্তু, আমার যে শোনার প্রয়োজন আছে। আমি এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি, যেখান থেকে ফেরার অজস্র পথ থাকলেও ফিরতে পারছি না! আমাকে শুনতেই হবে, তা না হলে সমাজ, মানুষ, আত্মীয়-স্বজন এমনকি তোমার ছেলেমেয়েরাই একদিন আমার দিকে আঙুল তুলে বলবে–আমার জন্য একটা নারীর জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। একজন নারী হয়ে অন্য একজন নারীর ক্ষতি করি কীভাবে।

বাণীর মুখের দিকে চেয়ে দিবাকর কী যেন বলতে গিয়ে থামল। টেবিলে সাজানো ফুলদানি থেকে টাটকা রজনীগন্ধার স্তবক ছিঁড়ে দু-আঙুলের চাপে পিষতে পিষতে বলল–একটা দুঃশ্চরিত্রার জীবন না-ই বা জানলে।

হোটেলের নিয়ন আলোগুলো ঝলমল করছে। সুদৃশ্য আকাশী বর্ণের সিলিং-এ ছোট ছোট বাল্বগুলো নক্ষত্রের আলো নিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে চারদিকে। আলো-আঁধারের সংমিশ্রণে অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে। একজন একজন করে জমতে জমতে ভরে গেছে এসি রুম। বেজে উঠছে মিউজিক। হিন্দি গানের চটুলতায় পাশের টেবিলে দুটি অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে মনের সুখে নিচু স্বরে গান ধরেছে। বাণী আড়চোখে দেখে ভাবল; ওদের কাছে জীবন এখন শুধু ওড়ার। ডানা মেলে দিগন্ত পেরিয়ে যাবার। কোন সমস্যা নেই, ভাবনা নেই, দায় দায়িত্ব নেই। শুধু ডানার ছন্দ নিজেদের মেলে দেখার স্বপ্ন। ও বয়স হারিয়ে একটা সংযমের মোড়কে মুড়ে রেখেছি আমরা। ইচ্ছা থাকলেও ওদের ডানা মেলে হারিয়ে যেতে পারব না।

দিবাকর অনুমনা। স্যুপের বাটিতে সর পড়েছে দেখে বাণী তাড়া লাগায়, খেয়ে নাও।

পুবদিকের কোণে রাখা টিভিতে এখন বিজ্ঞাপনের উড়ন্ত মানুষটা জলাজঙ্গল, আকাশ-প্রান্তর পেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে। দিবাকর সাদা মেঘের মতই খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দিবাকর আহত মনে শুরু করল তার জীবনের গল্প।

ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল জীবনটাকে নিজের মতো করে গড়ে তুলব। অজ-পাড়াগাঁয়ে হতদরিদ্র পরিবারে জন্মে বিরাট স্বপ্ন দেখতাম। লেখাপড়া শিখে মানুষ হব। গ্রাম থেকে স্কুল-ফাইনাল পাশ করে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের হাত ধরে চলে আসি কলকাতায়। বড় বাজার অঞ্চলে এক কাপড় ব্যবসায়ীর গুদামে হিসাবরক্ষকের কাজ করে, নাইটে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হই। কাপড় ব্যবসায়ী ঘনশ্যামবাবু বড় অমায়িক ভদ্রলোক। থাকা-খাওয়া ছাড়া মাইনে হিসেবে প্রতি থান পিছু এক টাকা করে দিতেন। সারাদিন কাজের পর কলেজ স্ট্রিটে একটি নামকরা বই-এর দোকানে প্রুফ দেখতাম। পড়াশোনার খরচ বাঁচিয়ে প্রতি মাসে মা-বাবা ভাইবোনদের জন্য কিছু টাকা পাঠাতাম। বাবা সেই পয়সা জমিয়ে কিছু ধানজমি কেনেন। আস্তে আস্তে সংসারে সুখের আলো এসে পড়ে। ধাপে ধাপে উত্তরণ। ততদিনে আমি বাংলা নিয়ে এম-এ পাশ করে কৃষ্ণনগরে একটি কলেজে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু বড় বাজারের ওই কাজটা তখনও করতে হত।

ভাগ্যের চাকা কখন কীভাবে ঘোরে মানুষ টের পায় না। কলেজ স্ট্রিটে একটি বই-এর দোকানে প্রুফ দেখতাম। তার মালিক হঠাৎ মারা যায়, তার ছেলের দোকান বিক্রি করার কথা তুললে আমি ধার দেনা করে দোকানটা কিনে নিই। প্রথম একটি ছড়ার বই প্রকাশ করি। তারপর সেই ব্যবসার উন্নতি হয়েছে। আজ ‘পূর্ণ প্রকাশন’ তারই দৃষ্টান্ত।

অবস্থা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বপ্নের পরিধি বেড়ে যায়। চাহিদা বাড়ে। দেশে কয়েক বিঘা জমি কিনে নিই। পৈত্রিক ভিটেটুকু সরিয়ে দোতলা তুলি। ছোট ভাই শুভঙ্করের মাথা মোটা। বেশি লেখাপড়া হল না বলে সে চাষ-বাস নিয়েই থাকত। তার একার পক্ষে চাষ-বাস দেখাশোনা হচ্ছে না বলে পাশের বাড়ির সুরেশ নামে একটি ছেলেকে কাজে নিই।

যে আত্মীয়ের হাত ধরে আমার স্বপ্নজীবন শুরু, তারই অনুরোধে এক বন্ধুর মেয়ে সরমাকে বিবাহ করি। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সবং অঞ্চলের বনশ্রীনগর একটি গ্রাম। সরমা সুন্দরী, সুশ্রী এবং শিক্ষিতাও।

বিয়ের পর কয়েক বছর আনন্দে ডুবে থাকলাম। এবং পাঁচ বছরের ব্যবধানে তুহিন, নীরা ও জয়ন্ত আসে। সরমার ভালোবাসায় কোন কার্পণ্য ছিল না।

আমার কাজের পরিধি বেড়ে গেছে। ব্যবসার জন্য প্রায়ই কলকাতায় থাকতে হয়। প্রথম প্রথম সরমা তার একাকীত্বের দোহাই দিত। বলত-এভাবে একমাস দুমাস পরে বাড়ি এলে আমি কীভাবে কাটাই বলত? তাছাড়া

ছেলেমেয়ের লেখাপড়া কি এই অজ-পাড়াগাঁ থেকে সম্ভব?

সরমাকে আশ্বস্ত করে বলতাম–কটা দিন সবুর কর, দুটো সিজন যেতে দাও। কলকাতায় কোথাও ঘরভাড়া করে তোমাকে নিয়ে যাবো।

আপত্তি করত সরমা। বলত–এখান থেকে চলে গেলে জমি জায়গা সব লোকে লুটেপুটে খাবে। না বাবা–এই বেশ আছি। সংসারের প্রতি এই টানে আমি খুশি হতাম। সমস্ত দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলাম তার ওপর। পুরো সংসার একাই মাথায় করে রেখেছিল সে।

অর্থ, প্রতিপত্তির নেশায় কোন দিকে তাকাবার সময় ছিল না। তখন আমার বইর ব্যবসাকে বড় করার নেশা। বিদ্যালয় পাঠ্য ছাড়াও গল্প, উপন্যাস কবিতার বই ছাপতে শুরু করি। সফল হই। সময়ের অভাবে ঠিকমতো দেশে যেতে পারি না। দিবাকর থামে। হুইস্কি গ্লাসে বরফ দিয়ে আবার চুমুক দেয়। একটা ঘোর লাগা চোখে চেয়ে দেখে বাণীর দিকে। সারা হলটার ভিতর দুঃখী দুঃখী আলো। পাশের টেবিলে বিবাহিতা এক মহিলা কাঁদছে। ছেলেটি তাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছে। দিবাকর ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়; মহিলাটির চোখের জল তার কাছে কৃত্রিম বলে মনে হল। রাগে চোখ ফেরায় সেদিক থেকে।

–বাণী তাড়া লাগাল কী হল? থামল কেন?

দিবাকর বলল–বড়ো কষ্ট। আগের কথা ভাবলে বুক গুঁড়িয়ে যায়। টের পাইনি, একটা ধেড়ে ইঁদুর কখন কীভাবে গর্ত করে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে আমার ঘর-সংসার। টের পেলাম অনেক পরে। মা আগেই মারা গেছেন। বাবার অসুস্থতার খবর দিয়ে শুভঙ্কর চিঠি দিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবার কথা লিখলেও আমি কাজের চাপে বাড়ি যেতে পারলাম না। টাকা -পয়সা পাঠিয়ে ভালো ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দিয়ে চিঠি দিলাম। কিন্তু দু-একদিন পর কাজ হালকা হলে, কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ-ই বাড়ি গেলাম।

আমাদের বাড়িটা ছিল দোতলা। একতলার দুটো ঘর। একতলাতে শুভঙ্কর থাকে। নীচে এক কোণে ছ ফুটের ছোট একটা ঘরে বাবা থাকেন। ও ঘটরটাই বাবার চিরকালের প্রিয়। আগে বাবা-মা উপরের ঘরে থাকতেন, আমাদের বিয়ে হবার পর এই ঘরটাতে থাকতে শুরু করেন। এই ঘরের জানলা দিয়ে বাড়ির সমস্ত অংশ দেখা যায় বলে, অন্য ঘরে থাকতে চাননি।

শেষ বাস ধরে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত্রি হয়েছে। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। রাস্তার দুধারে গাছপালার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে গা ছমছম করে। বাড়ির কাছে এসে বাবার ঘরের জানলা থেকে আলো দেখতে পেলাম। বুঝলাম বাবা জেগে আছেন। আগে বাবার সঙ্গে দেখা করেই যাবো। বাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল, গেল গেল, সব গেল, পার। বুঝলাম, বাবা প্রলাপ বকছেন।

দরজার কড়া নাড়তেই শুভঙ্কর দরজা খুলে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল–এত রাত্রে? এলে কী করে?

–চলে এলাম, বাবা কেমন আছেন?

–ভালো নেই।

–ডাক্তার দেখিয়েছিস? ডাক্তার কী বলল?

–কী আবার বলে! ওষুধ দিয়েছে।

–এখন কী কষ্ট?

–কষ্ট বলতে, উঠতে পারে না; ঘোরের মধ্যে আছে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ভুল বকছে। কখনও আবার স্বাভাবিক। শুভঙ্করের সঙ্গে কথা বলার সময় বাবা হঠাৎ-ই চিৎকার করে উঠলেন–উঃ ঘোর পার, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। দেবা ও দেবা...।

বাবার চিৎকার শুনে শুভঙ্কর নিচু স্বরে বলল কী জানি, কেন বাবা থেকে থেকে এমন করে ওঠেন। বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে শুভঙ্কর মৃদু স্বরে বাবাকে ডাকল–বাবা, ও বাবা, দ্যাখো দাদা এসেছে।

–কে? কে এসেছে দেবা?

–হ্যাঁ বাবা।

–কোথায়? আমার দেবা কোথায়?

কাছে সরে গিয়ে বাবার হাত জড়িয়ে বলি–এইতো আমি, তোমার খুব কাছে।

–এত দেরী করে এলি বাবা, শেষ হয়ে গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে।

–চিন্তা করো না, ভগবানকে ডাকো, সব ভালো হয়ে যাবে।

–না রে, আমি আর ভালো হব না। আমার ডাক এসেছে, চলে যাবো রে, রাত্রে ঘুম নেই। অশুভ আত্মারা আমাকে তাড়া করে। অস্থির করে তোলে। বলতে বলতে বাবা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার চিৎকার

–গেল, গেল, সব গেল, পাপ, ঘোর পাপ। দেবা, তোর বড়ো সব্বোনাশ হয়ে গেছেরে।

বাবার অবস্থা দেখে শুভঙ্করকে জিজ্ঞেস করি–কবে থেকে এমন হল?

–গত সপ্তাহ থেকে।

–আমাকে খবর দিসনি কেন? তোর চিঠি পেয়ে ভেবেছি সামান্য জ্বর, অত গুরুত্ব দিইনি। এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছে আমাকে খবর দিতে পারতিস।

–কেন বৌদি খবর দেয়নি?

–কই না তো!

–সে কী! তোমাকে খবর দেবার জন্য বৌদি সুরেশের সঙ্গে তার বাপের বাড়ি গেছে। ওখান থেকে সুরেশ যাবে তোমার কাছে।

–সরমা বাপের বাড়ি গেছে। কবে?

–আজ পাঁচ-দিন হল।

–বাবার এই অবস্থা জেনেও সরমা বাপের বাড়ি বসে আছে, আশ্চর্য!

শুভঙ্কর নিচু স্বরে বলল–দাদা ছোটমুখে বড় কথা মানায় না, আর না বলেও থাকতে পারছি না, বৌদি আজকাল সুরেশের সঙ্গে প্রায়ই সিনেমা, যাত্রা, এখানে ওখানে চলে যায়। গত সপ্তাহে দীঘা থেকে ঘুরে এসেছে। আমার ভাল ঠেকছে না। আমি বিশ্বাস করি না। চিৎকার করে উঠি, কী বলছিস এসব?

সে রাতেই বাবা মারা গেলেন।

বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সরমা বাপের বাড়ি থেকে চলে এল। অন্যরকমের যে সরমা, সেটা টের পেলাম। বাবার মৃত্যু, সরমার ব্যবহার তখন আমাকে প্রতি মুহূর্তে ঘা দেয়। কাজ করার স্পৃহা চলে গেছে। কলকাতার দোকান চলছে কি চলছে না সে খোঁজখবর নিতেও ইচ্ছে করছে না। মনে হল আমার সুন্দর পৃথিবীটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

বাবার শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান চুকে গেলেও আমার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নেই। বাবার শেষ কথাগুলো টেপ রেকর্ডের মতো কানে বাজে, গেল, গেল, সব গেল, পাপ, উঃ কী ভীষণ পাপ। ভাবি, তবে কী বাবা এমন কিছু দেখেছিলেন, যা মুখ ফুটে বলতে পারেননি। তাতে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন ভাবি, সরমার প্রতি ততো বিতৃষ্ণা বাড়ে।

দেখতে দেখতে আরও তিনমাস কেটে গেল। শুভঙ্করের সঙ্গে কথাবার্তা নেই। ভিন্ন হয়ে গেল। সরমার সঙ্গে

সম্পর্ক থেকেও নেই। সুরেশ আসে যায়। আমার বিকার নেই। সুরেশ ও সরমার সম্পর্ক আমি মন থেকে বিশ্বাস করতে পারিনি। শুভঙ্করর কথায় গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু মনের ভিতর বিষ তীর। উপড়ে ফেলতে গিয়ে খুঁজে থাকি সত্যিটাকে। সরমাকে দুএকবার মৌখিক জিজ্ঞাসা করেছি, সরমা আমল দেয়নি। উল্টে শুভঙ্করের সম্পর্কে বিশ্রীরকমের মন্তব্য করছে।

দিবাকর সামান্য থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল–সত্যি কখনও চাপা থাকে না। আমার সামনে সরমা যতই সতীপনা দেখাক না কেন, তার শীরর গন্ধে এমন একটা অনুভব ছিল যাতে আমার সারা গা গুলিয়ে উঠত। স্বামী স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার ভিতরে বিরাট ফাটল ধরল। দুধারে ছিটকে গেলাম দুজন। সরমার প্রতি বিশ্বাস ভেঙে গেল অন্যকারণে, জমি কেনার জন্য বাড়িতে যে কয়েক হাজার টাকা রাখা ছিল সে টাকা চাইতেই সরমা বলল–সে টাকা আমি বাবাকে দিয়েছি।

–কেন?

–বাবা তোমার নামে বনশ্রীনগরে জমি কিনবে। ওখানে জমির দাম সস্তা।

–আমাকে না জানিয়ে তুমি এত বড় কাজ করলে কেন?

সরমার প্রতি সন্দেহ দেখা দিল আরও তীব্রভাবে। আমি যে কটা দিন বাড়িতে ছিলাম, সে কটা দিন সুরেশ একবারও আমার কাছে আসেনি। যে ছেলেকে নিজের পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছি, যাকে নিজের মতো করে ভালোবাসি, সে আমার সঙ্গে বেইমানি করবে, এমন কথা একবারও মনে আসেনি।

একদিন সরমা ঘনিষ্ঠ হতে এলে, গা গুলিয়ে ওঠে। ওর বুকে যেন অন্য পুরুষের গন্ধ পাই। ঘৃণায় সরিয়ে দেবার চেষ্টা করি। সরিয়েও দিই। আরও একটা অদ্ভুত কাণ্ড আমাকে অবাক করে দিল–ছোট্ট তুহিন, রাত্রে আমার পাশে শুয়ে হঠাৎই ধরফড় করে বিছানায় উঠে বসে। সারা ঘরে এক চোরা চোখে চায়। কী যেন দেখে। আর আমার গলা জড়িয়ে বলে–জানো বাপীন, মা না সারারাত সুরেশ কাকুর সঙ্গে লুকোচরি খেলা খেলে, বলতে বলতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

বাবার আতঙ্কিত স্বর, তুহিনের জিজ্ঞাসু চোখ, আমাকে একেবারে ভেঙে দিতে থাকল। সরমার প্রতি বিশ্বাস বলতে কিছুই থাকল না। বুঝলাম, আমার অনুপস্থিতিতে সুরেশের সঙ্গে অবৈধ মেলামেলা করে সরমা, এমনকি তাদের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

একদিন রাতে সরমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম–সরমা, তুমি কি একলা হয়ে পড়েছ?

–কেন বল তো!

–আমার কাছে তোমার কি খুবই অসুবিধা হচ্ছে?

–এসব জিজ্ঞেস করছ কেন?

–তোমার সম্পর্কে লোকে যা-তা বলছে।

–লোকে বলল বলে তুমি তা বিশ্বাস করলে?

–বিশ্বাস হয়নি বলেই তো জিজ্ঞাসা করছি?

–কি?

তুমি সুরেশকে ভালোবাস? সরমা চুপচাপ। চাপা গলায় হিসহিস শব্দ। কান্নার ফোঁপানি স্বর নিয়ে বলে–তুমিও শেষে–

–আমার ভাবনার কোন মূল্য নেই, তোমার কথাই আমার ভাবনা। বলো তুমি কি সুরেশকে–।

–না। সরমার দৃঢ় গলা।

–ভালোবাসো না অথচ রাতের পর রাত একসঙ্গে এক বিছানায়– ।

–কী যা তা বলছ?

–যা সত্যি, তাই বলছি?

সরমা কাঁদে। নিজেকে গ্লানি থেকে মুক্ত করতে আমাকে নানানভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে, পারে না। এক সময় স্বীকারোক্তির মতো করে বলে–মানুষই তো ভুল করে, আমি যদি কোন ভুল করি, আমাকে ভালো হবার সুযোগ দেবে না! একবার অন্তত ক্ষমা করো।

সরমার কথায় কর্ণপাত করিনি। মনে হচ্ছিল গলা টিপে শেষ করে দিই। নিজেকে সংবরণ করি ছেলেমেয়ের কথা ভেবে। সরমা আবার মা হয়েছে জেনে মনটা আরও বিষণ্ন হয়ে ওঠে। নিজেকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করি। বুকের ভিতরে পাহাড় পরিমাণ রাগ ঝাঁকিয়ে ওঠে। বুঝতে পারি, সরমার জীবনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। একটা প্রশ্ন থেমে থেমে বিঁধে থাকে বুকে–সরমা কি সত্যিই মনেপ্রাণে সুরেশকে ভালোবাসে, না জৈবিক আনন্দের একটা খেলার নেশা। নিজের প্রতি দোষারোপ করি। বিয়ে করে সংসারের চাহিদা মেটাতে সময়ের দাসত্ব করে চলেছি। একবারও ভেবে দেখিনি–সরমারও একটা চাহিদা আছে। তার মন আছে। তার সঙ্গহীনতার কারণে কেউ এসে দখল করেছে সেই মনকে। এতে তারই বা দোষ কতটুকু। ওকেও বোঝা দরকার। মনে মনে ঠিক করি, ও যদি সুরেশকে নিয়ে বাঁচতে চায়, চলে যাক। আমি ওদের মাঝে দেয়াল হব না।

ঘুম নেই। দু-চোখে ঘুম নেই। দিনরাত্রি সব এক। কলকাতায় চিঠি লিখে দোকান বন্ধ রাখতে বলেছি। মনে মনে আমি ঠিক কী করতে চাইছি, কী করব ভেবে উঠতে পারছি না। উদভ্রান্তের মতো জীবনের বিভীষিকায় পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে যাচ্ছি। সমাজ, সংসার, লোকলজ্জার ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখি। মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচি। সব হারানো মানুষের পিছু নেয় শয়তান। সারা দিন বসে বসে পরিকল্পনা করি–পৃথিবী থেকে 'সুরেশ-সরমা' নামক যুগলকে চিরতরে মুছে দেব।

গভীর রাতে পাম্পের ভট্ ভট্ আওয়াজ শুনে ঘুম ভাঙে। সমস্ত লোম কুপ সজাগ হয়ে ওঠে। তুহিন নড়েচড়ে পাশ ফিরে শোয়। বিড়বিড় করে–এবার খেলা শুরু হবে। লুকোচুরি খেলা। খাটের নিচে মেঝেয় মাদুর পেতে সরমা শুয়ে আছে। সে ঘুমিয়ে গেছে কি জেগে আছে বুঝতে পারিনি।

ভট্ ভট্ শব্দে সুরেশের মুখ ভেসে উঠে। অমনি আমার বুকের ভিতর থেকে মত্ত বাঘটা হুঙ্কার দিয়ে পথে নামে। ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে দিঘি পাড়। আমি জানতাম। পাম্পের কাছাকাছি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সুরেশ।

কদম গাছের নিচে শুয়ে থাকা মানুষটার গায়ের চাদর এক ঝটকায় খুলে চিৎকার করি–এ্যাই শুয়োরের বাচ্চা, ওঠ। সুরেশ ওঠে। আমাকে দেখে বিষম খায় যেন। ভয়ও পায়। থতমত খেয়ে বলে–দাদা, এত রাত্রে আপনি?

–চুপ, দাদা বললে জিভ কেটে নেব। তোর বেকারত্বের কথা ভেবে নিজের বাড়িতে রেখে পড়াশোনার খরচা জুগিয়েছি। মানুষ হবার সুযোগ দিয়েছি, আর তুই কিনা আমার এমন সর্বনাশ করলি। বল শালা...।

সুরেশ পাথর। কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। পালিয়ে যাবার চেষ্টাও করল না। সুরেশকে দেখতে থাকলাম নিঃশব্দে, মনে মনে প্রশ্ন করলাম–ওর কী এমন পৌরুষ আছে যে আমার সোনার খাঁচার পাখিটাকে আকর্ষণ করে। কী এমন শক্তি আছে আমার ভালোবাসা পরাভূত হয়ে পড়ে!

আমাকে কঠোর অথচ শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখে সুরেশ বলল–দাদা।

–চুপ একটা শব্দ করলে খুন করে ফেলব।

–বিশ্বাস করুন, কোথা থেকে কী যে হল আমি কিছুই জানি না। রোজ রাত্রে বৌদি যেভাবে আকর্ষণ করতো আমি না গিয়ে পারিনি।

–তুই সরমাকে ভালোবাসিস?

–না।

–আশ্চর্য! ভালোবাসা নেই অথচ রাতের পর রাত একটা বিবাহিত মেয়েকে নিয়ে খেলতে তোর লজ্জা হল না।

–এসবের উত্তর আমার জানা নেই। বৌদির আকর্ষণ আমি ফেলতে পারিনি।

–চুপ, আর শুনতে চাই না।

ধমক খেয়ে সুরেশ চুপ করে যায়।

আমি কর্কশ স্বরে বলি–জীবনে বহু কষ্ট সহ্য করেছি। আজ তোদের দুটোকে মেরে ফাঁসিতে যাবো। বলতে বলতেই ছুরিটা উঁচিয়ে ধরলাম সুরেশের বুকে।

সুরেশ পা দুটো জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল– আমাকে ক্ষমা করো, আমি আজই এখান থেকে চলে যাবো। আর কখনও আসব না।

সুরেশের কথায় কী এমন ছিল জানি না, ছুরিটা নামিয়ে বললাম–যা ভাগ পালা, আজ রাত্রে যেমন করে পারিস সরমাকে নিয়ে পালা। তোদের ছায়াও যেন না দেখি এখানে। যা, পালা।

সুরেশ ছুটতে থাকে, ছুটতে ছুটতে অন্ধকার হয়ে যায়। ঘরে ফিরে সরমাকে জাগাই। তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসি ফাঁসিতলার মাঠে।

সরমা কাকুতি মিনতি করে–আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে এখানে আনলে কেন?

–এখানে সুরেশ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

–দিবাকর, প্লিজ আমাকে ক্ষমা করো, শোনো, আমার কথা শোন।

–ক্ষমা করবো তোমাকে।

আমার অট্টহাসিতে দিগন্ত ভরে ওঠে। গাছ-পাতার ফাঁক দিয়ে কয়েকটা পাখি উড়ে যায়। কালপেঁচার কর্কশ ডাক শোনা যায়। আকাশের গায়ে একফালি চাঁদ ডুবে যেতে দেখে বলে ওই দ্যাখো চাঁদটা এখুনি ডুবে যাবে। আকাশের গা বেয়ে গড়িয়ে নামবে পৃথিবী ভর্তি অন্ধকার। তুমি ওই আঁধারে শেষ স্নান করবে সরমা। সুরেশও স্নান করবে। তারপর তোমরা এক নতুন দেশে যাবে। অনন্ত প্রেমের বাঁধনে বেঁধে দেব তোমাদের।

–তুমি পাগল হয়ে গেছ দিবাকর।

–পাগল, হ্যাঁ, তা-বটে। সবাই পাগল হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে। শুধু আমিই এখনও ভালো মানুষ। দ্যাখো পুরো জ্ঞান রয়েছে আমার। তাই তোমার শরীরে অদ্ভুত মৃত্যু গন্ধ পাচ্ছি আমি।

–দিবাকর শান্ত হও।

–শান্ত, ভীষণ শান্ত আমি। প্রচণ্ড আক্রোশে সরমার হাত ধরে ছুটতে থাকি।

সরমা ছুটতে ছুটতে পড়ে যায়। হাঁটু ছিঁড়ে রক্তে ভিজে ওঠে মাঠি। দাঁতে দাঁতে চেপে তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসি ফাঁসিতলার মাঠে। দিঘি ভরা কালো জল অন্ধকারে ছল্ ছল্ করছে। বাতাসের আঘাতে ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে পড়ছে। জলের ধারে নিয়ে এসে সরমার গলাটা পেঁচিয়ে ধরি, বলি–জানো সরমা, তুহিন বলছিল সেও সুরেশকাকুর মতো লুকোচুরি খেলতে চায়। আমিও তুহিনের কাছ থেকে সেই খেলা শিখেছি। আজ আমিও সেই খেলা খেলব। জলপরীর মতো তুমি সাঁতার কাটবে। আমি দেখব। তুমি জলের অতলে তলিয়ে যাবে। কেউ তোমার নাগাল পাবে না।

সরমা পিছু হটতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে–তুমি বড় নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছো, আমাকে বিশ্বাস করো।

বিশ্বাসের কথায় আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। সরমাকে ঠেলে জলে ফেলে দিই। মুখটা চেপে ধরি জলে। ক্লান্ত হয়ে এলে আবার পাড়ে টেনে আনি। দিঘি পাড়ের ঝাঁকড়া গাছ দেখিয়ে বলি–এই গাছের ডালে ভট্টাচার্যির বড়

বৌ গলায় দড়ি দিয়েছিল। সবাই জানে সে আত্মহত্যা করেছে। আমি জানি, তাকে মেরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সরমা চিৎকার করে–আমাকে মেরো না, তোমার এক বংশধর আসছে আমার গর্ভে।

–কী বললে? বংশধর আসছে। বংশধর আমার! কখনো না। ও বাচ্চা আমার নয়। চিৎকার করি।

দুটো হাত শক্ত হয়ে বসে যায় সরমার গলায়। চিঁচি করে সে। ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসে। সরমা বেঁচে আছে কী মরে গেছে, বুঝতে পারিনি। জ্ঞানহীন দেহটা গাছের নিচে শুইয়ে দিই। গাছপাতার ফাঁক দিয়ে শেষ জ্যোৎস্না ঢেলে চাঁদ ডুবে যায়। হঠাৎ সুরমার মুখ দেখে কান্না পায় আমার। ওর জ্ঞানহীন দেহ বুকে তুলে কাঁদতে থাকি। তারপর নিজেও জ্ঞান হারাই।

জ্ঞান ফিরিলে বুঝতে পারি, আমাকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। প্রায় মাসখানেক পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরে শুভঙ্করের মুখে শুনলাম–সরমার মা-বাবা এসে তাকে নিয়ে গেছে বনশ্রীনগরে।

রাত সাড়ে-দশটায় বার বন্ধ হয়ে যায়। আর দশ মিনিট বাকি। গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে দিবাকর বলল–এই হল আমার জীবনের কাহিনী। জীবনের কলঙ্ক কথা কাউকে বলতে চাইনি। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় আমাদের দেশের বাড়িতে চলো, আমার ভাই শুভঙ্করের কাছে সবই জানতে পারবে।

বিল মেটাতে মেটাতে বাণী বলল–তার দরকার নেই। তোমার মুখের কথাই যথেষ্ট। সুরেশ কোথায়?

–সে অন্য মেয়েকে বিয়ে করে সুখে সংসার করছে।

–সরমা?

–জানি না।

এগারটা বাজতেই ওয়েটার তাড়া দিল। দিবাকরের তখন নেশা হয়ে গেছে। ঝিম্ মেরে বসে। বাণী তার হাত ধরে টান দিল, চল রাত্রি হয়েছে, ওদের নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে তো! বেশি দেরি হলে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়বে যে! ওদের নিয়ে যেতে কোন অসুবিধা হবে না তো?

চেতনাচ্ছন্ন মানুষের মতো দিবাকর টেনে টেনে বলল–চলো।

বারের বাতিগুলো নিভে গেল। সারা দিনের পূর্ণ হল ঘরটায় এখন একরাশ নিঃশব্দতা। বাণীর দেখে মনে হল, এভাবে জীবন কখন সম্পূর্ণতা লাভ করে না। চলতে চলতে ঘটনার সংঘর্ষে থেমে যায়। আবার শুরু করে চলা। খুঁজে পায় জীবন ছন্দ।

দরজার বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠল দুজনে। চৌরঙ্গীর ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি ছুটে চলল।

বাণীর বুকে মাথা রেখে নেশাচ্ছন্ন হয়ে ডলে পড়ল দিবাকর।

বাণী ভিতরে ভিতরে একটা বীজের স্ফুরণ অনুভব করছিল কিছুদিন। দিবাকরের জন্য ত্রিশ পেরুনো নারীসত্তায় জ্যোৎস্নার চন্দন ঝরে পড়ে। তার স্মৃতির ভিতরে অতনুর মুখ ধূসর হয়ে গেছে। স্মৃতির গভীর ক্ষত নিয়ে দিবাকরের মতো অসহায় পুরুষ আর ফুলের মতো দুই শিশু তুহিন-নীরার ভালোবাসায় সে যেন নতুনভাবে ফিরে পায় নিজেকে।

সেদিন দিবাকরের কোন খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন বাণী ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনল, তুহিন ও দিবাকর অসুস্থ। ডাঃ ঘোষ এসেছেন।

বাণীকে দেখে ডাঃ ঘোষ বললেন–আরে বাণী যে!

–নমস্কার। ওরা কেমন আছে?

–মনে হচ্ছে দিবাকরের টাইফয়েড। তুহিনের সর্দি-কাশি। ওষুধ দিয়েছি, ভালো হয়ে যাবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

দিবাকর জ্বরে বেহুঁশ। বাণীর উপস্থিতি সে টের পেল না। দিবাকরের কপালে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করে বলল– কবে থেকে এমন অবস্থা, খবর দাওনি কেন?

তুহিন হাসল।

নীরাকে বাটি করে জল আনতে বলে, সারা ঘরে চোখ বুলায় বাণী। জল আনলে বাণী দুজনের কপালে জলপট্টি দেয়। তুহিনকে ওষুধ খাইয়ে ঘরের এলোমেলো জিনিসপত্র গোছায়। ঘর মুছে বেরুতে না বেরুতেই তুহিন বমি করে। সারা ঘরে টকটক গন্ধ। বাণী তুহিনের বুক চেপে ধরে–কী রে আর বমি করবি?

–না।

তুহিনের মুখ মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। ফিনাইল দিয়ে পুনরায় ঘরটা মুছে সে। নীরার জন্য কিছু খাবার দরকার। দুমুঠো চাল বসিয়ে দিবাকরের ঘরে ঢুকে ঘড়ি দেখল–রাত পৌনে দশটা।

বাড়ি ফিরবে না ভেবেই মাকে ফোন করে দিবাকরের ঘরে এসে কীভাবে আটকে পড়েছে জানিয়ে দিল। মা বললেন, কী আর করবি। থেকে যা।

নীরাকে খাইয়ে মেঝেয় বিছানা করে দিল। তুহিনকে শোয়াল। নিজে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল দিবাকরের বিছানার সামনে। জ্বর পরীক্ষা করল।

সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত সময় কোথা দিয়ে যে চলে গেল, বুঝতে পারল না। নীরা বিছানায় উসখুস করতেই সে জিজ্ঞাস করল–কি ঘুম আসছে না?

–না?

–কেন? কী হয়েছে? মুমানোর চেষ্টা করো।

–মাসিমণি, বাপীন ভালো হবে তো?

–হ্যাঁ কেন ভাল হবে না। ডাক্তার দেখেছে। সামান্য জ্বর। ও ঠিক হয়ে যাবে।

বাণীর কথা শেষ হল না। নীরা উঠে তার আঁচল ধরে টান দিয়ে বলল–মাসি আমার পাশে শোও। বাপীন প্রতিদিন আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

বাণীকে জড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমালো নীরা। নীরা ঘুমিয়ে পড়লে তুহিনের কপালে হাত রেখে বাণী বুঝল, তুহিনের জ্বর আসছে। মাথায় জলপট্টি দিয়ে তার শান্ত সুন্দর মুখে চুমু খায়। চুমু দিয়ে বুঝতে পারে তার বুক শির শির করছে। তার বুকের ভিতরে হঠাৎই মায়ার জগৎ সৃষ্টি হয়। সেই জগতের কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়। মাতৃত্ব কী, তা জানে না সে। অথচ নারী বলেই তার রক্তে অনুভূতি ছড়িয়ে যায়। রোমাঞ্চকর স্বাদে পুলকিত হয়ে ওঠে। সন্তান যেমন হোক, যাঁরই হোক মাতৃত্বের কাছে সবই সুন্দর। আপন করে নিতে জানলে অপরিচিতও প্রিয় হয়ে ওঠে। এ অনুভূতি যাদের আছে তাদের কাছে সব সন্তানই ঈশ্বরের। আবেগে সে তুহিনের উত্তপ্ত গালে গাল ঠেকিয়ে সমস্ত উত্তাপ শুষে নিতে চাইল যেন।

নীরার দিকে অভিভূতের চোখে দেখল, তার চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে। ঠোঁটে মৃদু হাসি। বাণী বুঝল, একটা স্বপ্নের দেশে ঢুকে পড়েছে নীরা। স্বপ্নে অনন্য জগতের স্বাদ পায় মানুষ। অবাধে বিচরণ করে। আত্মার শুদ্ধতা থেকে স্বর্গীয় সুষমা ধরা দেয়। সে নীরার বুকে কান পাতে। যদি তার স্বর্গীয় স্বপ্নময় চেতনা ছোঁয়া যায়। তার কম্পিত ঠোঁটের ভাষা বোঝার চেষ্টা করে। এক সময় অস্পষ্ট স্বরে নীরা ডাকে–মা, ওমা, মা...। মা ডাক শুনে বাণীর সারা শরীর শিরশির করে। এক ধরনের সুখ শরীর বেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বড়ো ভালো লাগে তার এই মা-ডাক।

নীরার বুকে হাত রাখতে রাখতে এক সময় সুখানুভূতিতে যেন মরে যায়।

রাত দেড়টা। বাণীর তন্দ্রা আসে। সে চেয়ারে বসে খাটের বাজোতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। বাইরে কিছু শব্দ হতেই বাণী চমকে জেগে ওঠে। দিবাকরের কপালে হাত রাখে। জ্বর কমেছে দিবাকরের।

জাগরণে ক্লান্তি আসে। উঠে জানালায় দাঁড়ায়। মধ্য রাত্রির নিঃস্তব্ধ কলকাতা। দিবাকরের জানালা দিয়ে শিয়ালদা, রাজাবাজার, নারকেলডাঙার অনেকটা অংশই দেখা যায়। ওদের ফ্ল্যাটের নিচে বস্তি। বস্তির টালির ঘরগুলো যেন প্রেতাত্মার মতো দাঁড়িয়ে। বস্তির মাথায় রাতের পুরানো চাঁদ। চারদিকে জ্যোৎস্ন ভরা পৃথিবী। আস্তে আস্তে জ্যোৎস্না মুছে আলো-আঁধারি মাথা ভোর নামছে। বিশ্বচরাচরে এক শুভ গন্ধ। চাঁদের মুখ দেখে বিষণ্নতা–ঊষার সন্ধিক্ষণ।

উৎকণ্ঠার রাত যে এত দীর্ঘ হয় তা টের পাইনি আগে। আর দেরি করা ঠিক হবে না ভেবে উঠল। রোজ সকালে স্নান করা অভ্যাস তার। বাথরুম সেরে একেবারে স্নান করে নেয়। এখানে স্নান করার কথা ভাবতে গিয়ে হাসি পেল। এ বাড়িতে মেয়ে বলতে নীরা। সে তো এখনও ফ্রক ছাড়েনি।

বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে জল দিল। শরীরে শক্তি আনার চেষ্টা করল। চায়ের জল চাপিয়ে টুকিটাকি কাজ সারাল। রান্নাঘর হাতড়ে চাল ডাল, তরকারি আছে কিনা দেখল। কিছুই নেই। বাজারে যেতে হবে।

নীরা ঘুম থেকে ওঠে দেখল, মাসিমণির চা করা হয়ে গেছে। সে গিয়ে বাণীর পাশে দাঁড়িয়ে বলল–তুমি সারারাত ছিলে?

–তোমার কী মনে হয়?

নীরা কথার জবাব দিল না, হাসল। বাথরুম গেল। দিবাকর ও তুহিন জেগে উঠেছে। দিবাকর প্রচণ্ড দুর্বল। উঠতে পারছে না। বাবার অবস্থা দেখে তুহিন ক্ষীণ স্বরে ডাকল, মাসিমণি, একবার এ ঘরে এসো।

রান্নাঘর থেকে ছুটে এল বাণী। দিবাকরকে ওভাবে ওঠার চেষ্টা করতেই সে স্নেহের স্বরে বলল–দাঁড়াও, উঠতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বাণীকে দেখে দিবাকর অবাক। অস্পষ্ট স্বরে বলল–তুমি? তুমি আর কত করবে।

–কথা নয়, চুপ করে শুয়ে থাকো।

–আমি একবার বাথরুমে যাবো।

–হাঁটতে পারবে!

–পারব।

দিবাকরকে ধরে টয়লেটের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল। নীরাকে ডেকে বলল–বাপীন বেরুলে ব্রাশ ও মাজন দেবে, আমি ততক্ষণে চা করে নিই। বাসি ঘর গুছিয়ে ফেলি।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে বাণী বলল– আগে খালি পেটে এই ট্যাবলেটটা খেয়ে নাও। পনের মিনিট পরে চা খাবে। তুহিনকেও গলা উচিয়ে ডাকল, বাবু ওষুধ খেয়ে যাও।

চা খেয়ে দিবাকর বিছানায় আড় হতে হতে জিজ্ঞেস করল–তুহিন কেমন আছো?

–ভালো। তবে জ্বর আসছে মাঝে মাঝে। ডাঃ ঘোষ ব্লাড, ইউরিন, স্টুল পরীক্ষা করতে বলেছেন। বেলায় ওনার কম্পাউন্ডার এসে সব নিয়ে যাবে।

দিবাকর ঘরের চারদিক দেখে বলল, তুমি আবার এত কষ্ট করতে গেলে কেন? মতির মাকে বললেই সব পরিষ্কার করে দিত।

বাণীর কথায় ধমকের সুর –থাক খুব হয়েছে, বেশি কথা বলো না। চুপ করে শুয়ে থাকো। তোমাদের এত

শরীর খারাপ একটা খবর দেবার প্রয়োজন মনে করোনি। আমি কি এতই পর তোমাদের?

–না, তা না, আসলে বাইরে বেরিয়ে ফোন করার মতো অবস্থা ছিল না। ওই ছোট মেয়েটা তবু অনেক করেছে। নীরা লজ্জা পেল–যাঃ আমি আবার করলাম কোথায়? জ্বর গায়ে উঠে তুমিই তো রান্না করেছ। খাইয়েছ। দোকান গেছ। যখন একেবারে উঠতে পারলে না, তখন আমি একটু আধটু করে দিয়েছি।

–আচ্ছা, আচ্ছা খুব হয়েছে, বাবার সঙ্গে বক বক করো না, পড়তে বসো। তোমার তো সামনে মাসের চৌদ্দ থেকে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। যাও, ওঘরে গিয়ে ইংলিশ পড়ো, আমি গিয়ে ধরব। দিবাকরের দিকে চেয়ে বলল–ডাঃ ঘোষ আসবেন সাড়ে আটটায়, ততক্ষণে এদিকের কাজ সেরে নিই। ডাঃ ঘোষের গাড়ি করেই আমি একবার তালতলায় যাবো।

–কেন?

–কেন আবার। বাড়ি যেত হবে না। স্নান করা দরকার। তাছাড়া কাল থেকে রয়েছি, মা ভাবছেন। মার সঙ্গে দেখা করে স্কুল হয়েই আসব। নীরার দু-একদিন স্কুল কামাই হয় হোক। ও থাকলে তোমাদের একটু দেখাশোনা করতে পারবে।

–স্নান করলে এখানে করে নাও। দুর্বল গলায় তুহিন বলল।

–স্নান করবো এখানে?

–হ্যাঁ। আমাদের বাথরুমে প্রচুর জল আছে।

–তুমি একটি হাঁদা।

–কেন?

–বলি এখানে স্নান করলে আমি কি পরবো তোমার হাফ-প্যান্ট না নীরার ফ্রক?

কথা শুনেই তুহিন নীরা দু-জনেই হা-হা কেরে হাসে।

দিবাকর চমকে ওঠে। বুকের ভিতরে এক রমণীয় কামনার পাখি যেন ঠোকরায়। সে টের পায়, তার বুক শিরশির করছে। বড়ো শীত করছে। ঘরের চারপাশে থেকে রমণীর গন্ধ তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে।

সে জানলা দিয়ে দেখল, সামনের কদম গাছে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে। দুটো পাখি বসে আছে ডালে। দেখতে দেখতে তার বুকের ভিতর একটা স্বপ্নময় জগৎ তৈরি হয়। একটি নারীর হাঁটা চলা, স্নেহ, ভালোবাসা, স্পর্শ, অনুভবের বৃত্তে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

একটা রক্তবর্ণ মেঘের ভিতরে বিমূর্ত স্বপ্নময় রমণী হারিয়ে গেলেই মেঘ কেটে যায়। চারদিকে অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। দিঘির স্বচ্ছ জলে এক জলপরীর কাতর ধ্বনি। ধ্বনি ক্রমে ঢেউ ছন্দে মিলায়। সে দেখে, বিবস্ত্র হয়ে সরমা হেঁটে আসছে। তার আসার মুহূর্তে ভারী হয়ে উঠে চারদিক। ক্লান্ত বিবর্ণ সে গায়ের চাদর মুখ পর্যন্ত ঢেকে নেয়।

দিন পনের পরে দিবাকর সেরে ওঠে। একটা অশুভ সময়ের সঙ্গে লড়াই করে বাণী যেন তাদের মুক্তি দিয়েছে। তার প্রতি কৃতজ্ঞ দিবাকর। সেদিন ডাক্তার ঘোষের চেম্বারে চেক-আপ করাতে এলে, একান্ত বন্ধুর মতো ডাঃ ঘোষ বললেন–একটা কথা বলব দিবাকর।

–বলুন।

–এই কয়েক মাসে তোমাদের সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তারই সূত্রে বলি, সংসারে মেয়ের প্রয়োজন আছে। শুধু প্রয়োজন নয়, বিশেষ ভূমিকা আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

দিবাকর মাথা নাড়ে।

–তাই বলছিলাম, তুমি আবার বিয়ে করো।

–বিয়ে।

চমকায় দিবাকর। দুঃখের হাসি হেসে নিজেকে সামলায়। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলে–আপনি আমার সব কথা জানলে কখনো এমন বলতেন না।

–বাণীর মুখে সমস্ত শুনেছি। সত্যি একমাস ধরে তোমাদের জন্য ও যা করেছে তার তুলনা হয় না।

–বাণীর ঋণ শোধ করা যাবে না।

–সেই জন্যই তো বলেছিলাম, তুমি নতুনভাবে জীবন শুরু করো।

দিবাকরের ভিতরে এক আলো জ্বলে ওঠে। তার উজ্জ্বলতা সে টের পায়। এবং পাশাপাশি গভীর অন্ধকারের অস্তিত্ব টের পেয়ে চমকায়। বিয়ে-সংসার-স্ত্রী নামক শব্দগুলো তার রক্তের ভিতরে তার আলোড়ন তোলে। সে ধেয়ে আসা রাগ মুছে ফেলতে গিয়েও পারে না। ডাঃ ঘোষের কথায় বুকের ভিতর শিরশির করে ওঠে। তার কথা তাকে স্পর্শ করে থাকে।

একজন মানুষকে ঘিরে লতা-পাতার মতো জড়িয়ে বৃদ্ধি পায় জীবন। জীবনের চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষজন, আত্মীয় স্বজন, অনাত্মীয়কেও অস্বীকার করা যায় না। ওরা আছে বলেই জীবন এত সুন্দর, স্নেহময়। অপরিহার্য ওদের থাকা। কিন্তু ওদের মধ্যে কারও কারও উপস্থিতি কারও আচার-আচরণ মানুষকে, মানুষের সমাজকে কলুষিত করে। সমাজে তার বিষময় থাকা কাউকে ধ্বংস করে দেয়। সরমার বিষ নিঃশ্বাসে পঙ্গু দিবাকর।

ডাঃ ঘোষ দিবাকরের দিকে চেয়ে ভাবে, বাণীই পারবে দিবাকরকে এই মানসিক অসুস্থতা থেকে বাঁচিয়ে তুলতে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ডাক্তার বললেন–কী হল চুপ কেন? কিছু তো বল।

–আপনি আমার সমস্ত কথা জানার পরও এ পথে আবার ডুবতে বলছেন?

–পৃথিবীর সবাই সরমা নয়। যা অতীত তাকে আঁকড়ে থেকে কী লাভ। বর্তমানকে সামনে রেখে মানুষের স্বচ্ছন্দ চলাই জীবন ধর্ম। হারিয়ে গেছে বলে শোকে পাথর হয়ে খোঁজার চেষ্টা করব না, তাই কি হয়? জীবনকে অস্বীকার করার মতো মুর্খামি আর কী থাকতে পারে!

–নাঃ ডাঃ ঘোষ, তা হয় না, আমার ভয় করে। এই বেশ আছি।

–একে বেঁচে থাকা বলে না, বলে বাঁচার ছলনা। তোমার নিজের জন্য না ভাবো ছেলে-মেয়ের কথা ভেবে মানসিকতা বদলানো দরকার।

–ওদের জন্যই ভয় ঘিরে ধরে। আমি চাই না কোন নারীর নিষ্ঠুর আচরণে ফুলের মতো দুটো নিষ্পাপ জীবন নষ্ট হয়ে যাক।

–সব ফুলে কাঁটা থাকে না। অথচ সব ফুল গাছ একই মাটিতেই জন্মায়। পরিবেশ ও জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণে ভিন্ন ভিন্ন ফুলের সম্ভার। মানুষের জীবনেও তাই। ভেবে দেখ তুমি তো পারলে না, নিজের সুখের জন্য ছেলেমেয়ে দুটোকে পর করে দিতে। পারনি, পারবেও না। তাছাড়া ওদের মানসিক বৃদ্ধি, উত্তরণ সবকিছুর পিছনে পরিপূরক একজন নারীর স্পর্শ প্রয়োজন। দিবাকরের মুখ দেখে ডাক্তার আরও বলেন–আমি ডাক্তার হয়ে বলছি, একাকি ওদের শিশুমনে যে প্রভাব ফেলছে তাতে পরবর্তী জীবনে ওদের ভীষণ ক্ষতি হবে। একা থাকার প্রবণতায় ওরা প্রভাবিত হবে। তার ফল হবে মারাত্মক।

ডাক্তার থেমে আবার বললেন–চরিত্র মানুষের জন্মগত নয়। পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা সাহচর্য কিছুটা প্রভাব ফেলে। আমরা যদি একটু দায়িত্বশীল হয়ে এগিয়ে যাই তবে প্রতিটি মানুষের চলার পথ সহজ সুন্দর হয়ে উঠবে। মেয়েদের বিপথগামিতার পিছনে রয়েছে সমাজের কিছু মানুষের ভ্রুকুটি, উপেক্ষা। আমরা পুরুষেরা তার কতটুকু স্বীকার করি!

–কিন্তু মেয়েদের আব্রু সুন্দরের প্রতীক। তা নষ্ট হলে কী মূল্য থাকে, বলুন।

–অমন করে বলছ কেন? একটু ভেবে দেখ। এদের নষ্টতার মূলে আমরাই। আমরা কী কোনদিন ওদের মন, চাওয়া পাওয়া, বোঝার চেষ্টা করেছি? করিনি। পৌরুষের জোরে পৌরুষত্ব জাহির করি। অনেক সময় মানসিক নিঃসঙ্গতা ও একাকি থেকে অনেক ঘটনা ঘটতে পারে। অর্থনৈতিক দিকটা অনেকের কাছে বড়ো হয়ে ওঠে। তবে দৈহিক তাড়নায় যারা বিপথে নামে, তাদের কথা ভিন্ন। এবং সে সংখ্যা খুবই কম। তা যদি প্রবল হতো, নারী পুরুষের মিলন এত পবিত্র হতো না। অনাচারে ভরে যেত পৃথিবী। জানি, তোমার স্ত্রী তোমাকে ঠকিয়েছে। তার জন্য তোমার নির্বুদ্ধিতা আর সঙ্গহীনতাই দায়ী। তোমারও অনেক দায়িত্ব ছিল তুমি তা করনি। যাক, যা অতীত তাকে নিয়ে ঝগড়া না করাই ভালো। ডাক্তার হয়ে মানসিক ব্যাধিগুলি উল্লেখ করলাম মাত্র।

চমকায় দিবাকর। ডাঃ ঘোষের কথাগুলো তার বুকে বিঁধে। সত্যিই তো এমনভাবে কোনদিন ভাবেনি সে। অর্থ প্রতিপত্তির পিছনে ছুটে বেড়িয়েছি সরমার প্রতি মনোযোগ দিইনি। পরক্ষণেই বিরোধী ভাবনা পেয়ে বসে, তাই বা হবে কেন? তা বলে পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করবে? এসব মানা যায় না।

দিবাকরের যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখে ডাঃ ঘোষ মনে মনে ভাবেন, এ এক ধরনের অসুখ। নিজেদের মধ্যে কোন বোঝাপড়া নেই। দায়িত্ব, সততা নেই। তাই সংসার ভাঙছে। দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সংযমের অভাবে। আত্মবিশ্বাসের অভাবে সরমার মতো বহু নারী অপূর্ণতার অসুখে ভুগছে, ফলে তাদের অলক্ষ্যে হৃদয়ে ঢুকে পড়ছে একাধিক পুরুষ। আর সামাজিক অনুশাসনের পর্দা সরে যাওয়াতে এ প্রবণতা আরও বেড়ে গেছে। কারণ উচ্চ শিক্ষিত, অভিজাত পরিবারবর্গের মধ্যে বহুগামিতার প্রভাব বিস্তার করেছে। ইদানীং আসক্তি বাড়ছে প্রবলভাবে। ভয় লাগে, সংসার নামক মন্দিরের পবিত্রতা ধুলোয় মিলিয়ে না যায়। কেউ কাউকে বোঝে না। বোঝার চেষ্টা করে না। সরমা যদি কোন ভুল করেই থাকে দিবাকরের উচিত ছিল তা যাচাই করে ভালো হবার সুযোগ দেওয়া। দিবাকর তার অন্যায় বড় করে দেখছে। উৎস তলিয়ে দেখেনি, দেখলে নিজের বিকৃত মুখের প্রতিচ্ছবি আগেই চোখে পড়ত তার।

ডাঃ ঘোষের কথার রেশ ধরে দিবাকর বলল–আমি এতটা নির্মম হতে চাইনি, যতটা আপনারা শুনেছেন। নিজে তাকে অন্যায় করতে দেখেনি, আর আমি-ই যদি কোন অন্যায় করতাম তাহলে সেও তো মুখ বুঝে সংসার করে যেত। সব দিক ভেবে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তাকে মেরে ফেলিনি। বাঁচার অধিকার দিয়েছি। ভেবেছিলাম, সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হলে, ওকে বাড়ি নিয়ে আসব। কিন্তু খেলাটা যে অন্য! ওর বাবা-মায়ের গভীর ষড়যন্ত্র, লাভ আমার জীবন ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল।

–লোভ?

–সরমা আমার ব্যবসার টাকা থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা আমার অজান্তে ওর বাপের হাতে তুলে দিয়েছিল। কী উদ্দেশ্যে? তা জানতাম না, ধরা পড়ে বলেছিল, জমি কেনার জন্য। শুনেছি সেই টাকা নিয়ে শ্বশুর মশাই নিজের নামে ধান-জমি কিনেছিল। ওই টাকা চাইতে গেলে লোক দিয়ে আমাকে মেরে ফেলার চক্রান্তও করেছিল, বলব আপনাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলব।

দিবাকরকে আশ্বস্ত করতে ডাঃ ঘোষ বললেন–ওসব থাক, আমার কথা ভেবে দেখো। শোনো, আমি কিন্তু এত কথা বললাম, বাণীর কথা ভেবেই। বাণী তোমাকে বাঁচাতে পারে।

–দিদিমণির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ওনার কাছে যা পেয়েছি তার চাইতে বেশি পাওয়ার সাহস নেই। একটা ফুলের সম্পর্ক নষ্ট হোক ঐ আমি চাইনে ডাক্তার।

–তোমাদের সংসারে বাণী গেলে ও খুবই খুশী হবে। ওকে আমি খুব ছোট থেকেই জানি। তুমি রাজি হলে, আমি এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

দিবাকর ক্ষীণস্বরে বলল–আপনি যা ভালো বোঝেন করুন।

সেদিন বাড়ি ফিরে দিবাকর সারা দুপুর ঘুমাতে পারল না। ঘুমন্ত নীরা ও তুহিনের দিকে চেয়ে ভাবে, আমি কোন ভুল করছি না তো? বাণী সত্যি এদের মা হয়ে উঠতে পারবে! বিয়ের পর বাণীর যদি বাচ্চা হয়, তখন

কী পারবে এদের মাতৃত্ব দিয়ে বাঁধতে! ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয় সে।

দিবাকরের সারা দুপুর ঘুম এল না। ডাঃ ঘোষের কথাগুলো মৃদু ঢেউয়ের মতো ছুঁয়ে যাচ্ছিল তাকে। অহেতুক ভাবনাগুলো বড় হচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল না কী করবে। বাণীকে সে ভালোবাসে, বাণী জড়িয়ে গেছে তার জীবনের সঙ্গে। কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারবে না। তবুও ভাবনা থেকে যায়, আশঙ্কা খেলে বেড়ায় মনে।

দূর আকাশের বুকে একটা চিলের উড়ে যাওয়া ক্রমশঃ দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে সে দেখে অন্যদিক থেকে উড়ে আসছে আর একটি চিল। সে বুঝতে পারে না দুটোর মধ্যে কোনটা সত্য। হারিয়ে যাওয়া আর ফিরে আসার স্পন্দন তাকে স্পর্শ করে। একটু পরেই চোখ মেলে দেখে, দ্বিতীয়টাও হারিয়ে গেছে। সে তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে। মনে মনে ভাবে, আছে, আকাশের বুকে কোথাও না কোথাও আছে।

একটা পরিপূর্ণ সংসারে বাণীকে কল্পনা করতে গিয়ে সরমা'র মুখ ভেসে ওঠে। যন্ত্রণায় নীল হতে হতে ডাক্তার ঘোষের কথাগুলো মনে পড়ে, সরমাকে ক্ষমা করা উচিত ছিল, সত্য না জেনে কাউকে শাস্তি দেওয়া অন্যায়। কথাগুলো মাথার কোষে কোষে ধাক্কা দিতে থাকে। সে বিড়বিড় করে বলে, ভুল, সম্পূর্ণ ভুল, আমি তাকে বাঁচার সুযোগ দিয়েছিলাম, ক্ষমা করে আবার আমরা নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে পারেনি তার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে। তাই জয়ন্তের কতো নিষ্পাপ শিশুকে ভুলে থাকতে হয়েছে। কে জানে কেমন করে চলছে তাদের? কীভাবে বেঁচে আছে তারা!

সে চিন্তামগ্ন হয়ে হারিয়ে গেল কয়েক বছর আগের একটি ঘটনার ভিতরে।

সরমা বাপের বাড়ি চলে গেছে তিন বছর। কেউ কারও খোঁজ-খবর নেয় না। দিবাকর দেশের বাড়ির জমি-জায়গা, বিষয়-আশয় পাশের বাড়ির দেবুদার কাছে দেখাশোনার ভার দিয়ে, তুহিন ও নীরার হাত ধরে কলকাতায় চলে এসেছে। শ্যামবাজারে ফ্ল্যাট নিয়েছে। দুই শিশুকে নিয়ে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

লোকের মুখে শুনেছিল সরমার মেয়ে হয়েছে। জয়ন্ত ফুটফুটে হয়েছে। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। দ্বিতীয় কোন খবর রাখার চেষ্টা করেনি সে। মনে মনে ভেবেছিল, যতদিন না সরমা নিজ মুখে ক্ষমা চায়, নিজের থেকে চলে না আসে, কখনো ডাকতে যাবে না। মাঝে মাঝে পরিচিত একজনকে দিয়ে সরমার বাবাকে টাকাটা ফেরত দেবার কথা বলে। ভয় দেখায় টাকা ফেরত না দিলে জোর করে যে-কোনভাবে হোক আদায় করবে।

সরমার বাবা কোন গুরুত্বই দেয়নি, বরং উল্টো বলে পাঠাল, টাকা নিয়েছি কোন প্রমাণ আছে? কথা শুনে ব্যথা পেয়েছিল, সরমার প্রতি রাগ, অভিমান আরও দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল, আশ্চর্য হয়েছিল এই ভেবে, বাবা হয়ে মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে! মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে তাদেরই এগিয়ে আসা উচিত ছিল। বারবার খবর পাঠানোর পরও শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সবে যখন কী করবে ভাবছে তখনই ডাক মাধ্যমে সরমার একটা চিঠি পেল সে। সরমা লিখেছে, 'আমার মতো পাপিনীর মুখ দেখানোর অধিকার নেই। আমি অন্যায় করার জ্বালায় জর্জরিত হয়ে আছি। তোমার জয়ন্তকে সর্বশক্তি দিয়ে গড়ার চেষ্টা করব। ক্ষমা চাইবার ভাষা আমার নেই। তবুও তুমি যদি ক্ষমা করে কখনও ডাকো এদের বেড়া ভেঙে চলে যাবো। তোমার টাকাটা নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার প্রায়ই ঝগড়া হয়। বাবা আগামী মাসের দশ তারিখে টাকাটা দেবে। পারলে এসে নিয়ে যেও। আমি তোমার দয়ার অপেক্ষায়। এর বেশি কিছু বলার নেই। ক্ষমা করো। ইতি–হতভাগিনী সরমা।'

প্রায় তিন বছর পর চিঠি পেয়ে উৎফুল্ল দিবাকর। কিন্তু কোন উত্তর দেবার প্রবৃত্তি জাগল না। অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করল। অনেকেই বাচ্চাগুলোর মুখ চেয়ে সরমাকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব দিল। কেউ কেউ সাবধান করলো। একা একা যেও না।

ব্যবসার কাজে টাকার খুব প্রয়োজন হওয়ায় সে লোকমুখে সরমাকে দশ তারিখে যাচ্ছি বলে খবর পাঠাল। দোকান বন্ধ করে তুহিন ও নীরাকে এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে কলকাতা থেকে লাস্ট বাস ধরে যখন বনশ্রীনগর পৌঁছল, তখন রাত্রি বারোটা দশ। সরমার সঙ্গে বহুবার এসেছে, পথঘাট সবই চেনা, কোন অসুবিধের কথা

নয়।

বাস থেকে নামতে না নামতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো। গাঢ় অন্ধকার। বাস-রাস্তা থেকে অনেকটা ভিতরে, কাঁচা রাস্তা পার হয়ে বনশ্রীনগর যেতে হবে। কাদা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হবে ভেবে তার ভয় করছিল। ভেবেছিল বাসস্ট্যান্ডে তার জন্য কেউ না কেউ অপেক্ষা করবে। কেউ নেই।

অন্ধকার পিচ্ছিল পথ। চলতে গেলেই পা হড়কে যাচ্ছে। অসাবধান হলেই আছাড় খেয়ে কাদা মাখামাখি। আলো আঁধারিতে বিদ্যুতের ঝলক মাখতে মাখতে সে অনেকটা পথ এগিয়েছে। আরও কিছুটা পথ যাবার পর মনে হল কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। আর একটু এগুলেই বুড়ো শিবতলা, বড়ো পুকুর, হরির থান, পানবোরজ, পরের বাঁক ঘুরলেই শ্বশুর বাড়ি।

বুড়ো শিবতলা ছাড়িয়ে বড় পুকুরের সামনে আসতেই অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ চার মূর্তি তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কারো মুখ দেখতে পেল না সে। তাদের একজন শ্লেষের গলায় বলল–আরে জামাইবাবু যে–

চমকে উঠল দিবাকর। গলাটা তার খুবই চেনা। কিছুটা আন্দাজ করে বলল–কে, বড়দা।

–যাঃ শালা, আবার চিনে ফেলেছে! আপনি মশায় ভীষণ বেরসিক। শ্বশুরবাড়িতে আসবেন কোথায় একটু তাড়াতাড়ি। ফুর্তি-টুর্তি করা যাবে। তা না করে এলেন রাত বারোটায়।

–আসলে দোকান বন্ধ করে আসতে দেরি হয়ে গেল।

–তা কী করা যাবে! আসুন ফুর্তি এখানেই করি, মাল ছাড় ন তো।

–মানে?

–মানে এখনও বুঝলেন না? বোঝাচ্ছি। বলেই লোকটি দমাস করে একটা লাথি মারল দিবাকরের পেটে।

লাথিটা সহ্য করতে পারল না সে। পড়ে গেল। কাদার মধ্যে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একজন। পুকুর পাড়ের জঙ্গলের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারতে থাকল চারজনে।

একজন মুখ বিকৃত করে বলল– বল শালা হারামির বাচ্চা, বনশ্রীনগর কী মনে করে। কয়েকটি লাঠির ঘা পড়ল তার মাথায়। পেটের ওপর পা তুলে চটকে মোচড় দিতে দিতে দাঁতে দাঁত চেপে বলল–বল শালা কী জন্যে এসছিস?

হিক্কার মতো শব্দ করে দিবাকর বলল–সরমাকে নিয়ে যেতে।

–সরমা, তোর ঘর করবে না কোনদিন।

দিবাকরের মুখ থেকে আর কোনও কথা বেরুল না। মাথা দিয়ে গরম রক্ত গড়িয়ে তার মুখে ঢুকছে। কাদায় মুখ চেপে রেখেছে, শ্বাস নিতে পারছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। অন্ধকারে জীবনে শেষবারের মতো কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে দুবার মাত্র উচ্চারণ করল, তু-হি-ন, নী-রা। তারপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকল।

চারজন হিংস্র মানুষ তাকে মত্ত বাঘের মতো টেনে-হিঁচড়ে বড় রাস্তায় নিয়ে এল। বড় রাস্তায় একটা ট্যাক্সি দাঁড় করানো ছিল। চারজনে দিবাকরকে টেনে তুলল। নির্জন অন্ধকার ফুঁড়ে হেড লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ছুটে চলল আমতলার দিকে। আরও গভীর নির্জন গ্রামের এক জায়গায় গাড়ি এসে থামল। সতর্ক চারজনে দিবাকরকে চ্যাংদোলা করে ফেলে দিল এক জলাশয়ে।

অচেনা অজানা গ্রামের জেলেরা মাছ ধরতে এসে দিবাকরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে উঠেছিল দিবাকর।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমন কী থানার বড়বাবু প্রশ্ন করেও আসল সত্য জানতে পারেনি। আসলে সরমা কিংবা জয়ন্তের ওপর বিপদের ঘ্রাণ পেয়ে, আসল সত্য বলেনি দিবাকর। আজও সে কোনভাবে কারও কাছে প্রকাশ করেনি।

এক উকিল বন্ধুর পরামর্শে দিবাকর ডিভোর্সের কাগজ পাঠিয়েছিল। সরমা তা গ্রহণ করেছে। পাল্টা কোন প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

জানলার বাইরের পৃথিবী কি বিশাল ব্যাপ্ত, সুন্দর অসুন্দরের সীমাহীনতায় বাঁধা। সে ডিঙিয়ে যেতে পারে না। গভীর মনোসংযোগে সে দেখে বহুদূর আকাশের গা বেয়ে ডানা মেলে সাঁই-সাঁই করে উড়ে আসছে একটা চিল। তার কর্কশ ডাক দিগন্তের ভিতরে হারিয়ে গেছে। মন-প্রাণ দিয়ে চিলের উড়ে আসা দেখতে দেখতে নিজেকে ছুঁয়ে দেখে; বেঁচে থাকার স্বাদই আলাদা।

নীরা বিকেলের ঘুম থেকে উঠে দিবাকরের পাশে দাঁড়ায়। তাকে ছুঁয়ে থাকে, বলে–বাপীন কি দেখছ তখন থেকে! দিবাকর সম্মোহিত মানুষের স্বরে উত্তর দেয়–একটা চিল ডানা মেলে কোথায় যে হারালো, তখন থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় যে হারালো, কে জানে।

নীরা বাবার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে গিয়েও চুপ করে যায়। দেখে বাবার চোখের দু'কোণে চক্‌চক্ করছে দু-ফোঁটা অশ্রু। মুখটা রক্তবর্ণ পদ্মের মতো লাল। বাবাকে এমনভাবে বিমর্ষ এর আগে কখনও সে দেখেনি।

নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত দিবাকরের নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। বই ছেপে, তা জেলায় জেলায় প্রতি স্কুলে স্পেশিম্যান কপি পাঠানো, এজেন্ট নিয়োগ করা, বই পৌঁছানো, ছাপাখানা, বাইন্ডিং ইত্যাদি বহু কাজের মধ্যে জড়িয়ে যায়। সরকারবাবু একলা পারে না। এই তিন-চার মাস দিবাকর সারাদিনই দোকানে থাকে।

বাণীর যেন শেষ রুটিন হয়ে গেছে। স্কুল ছুটির পর নীরা-তুহিনকে স্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে কিছুক্ষণ পড়িয়ে রাতের রান্না করে তবেই বাড়ি ফেরে।

সকালে ডাঃ ঘোষ ফোনে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই বেশ রোমাঞ্চ লাগছিল তার। এক ধরনের রমণীয় লজ্জায় আড়ষ্ট হচ্ছিল সে। এই সময় দিবাকর বাড়ি থাকবে না জেনেই নীরার সঙ্গে ওদের বাড়ি গেল।

সমস্ত কাজ সেরে, তুহিনকে পড়িয়ে, নীরার চুল বাঁধতে বাঁধতে বাণী বলল–নীরা, তুমি বেশ বড় হয়েছ। এবার থেকে ঘরের টুকিটাকি কাজকর্ম শিখবে, আমি তো আর চিরকাল আসব না! আসা যাবে না।

–কেন?

–এমনি।

বাণীর কথা শুনে নীরা চুপ করে থেকেই হঠাৎ গলা জড়িয়ে বলে–আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না, তুমি চলে গেলে আমরা থাকব কার কাছে? বাপীন সারাদিন থাকে না, আমাদের ভয় করে। আমাদের ছেড়ে তুমি যেও না মাসিমণি। তুমি তো আমাদের মায়ের মতো।

–মায়ের মতো নয়, বল মা। পিছনে তুহিনের গলা। নিচুস্বরে বলে–মায়ের মুখটা আবছা মনে পড়ে। তার স্নেহ-মমতা ভুলে গেছি, তোমার স্নেহ-মমতা, আদর-যত্ন বড়ো সুখ দেয় মাসিমণি; তুমি চলে গেলে আমরাও চলে যাবো।

বাণীর চোখে জল। দুজনকে জড়িয়ে ধরল আবেগে। দুজনে তার বুকে মুখ লুকিয়ে বুভুক্ষু মাতৃগন্ধে বিহ্বল হয়ে রইল। বাণী মনে মনে ভগবানকে ডাকে, 'হে ভগবান আমাকে শক্তি দাও, আমি যেন জীবন দিয়েও এদের হাসি ধরে রাখতে পারি।'

মাসিমণির বুকে মাতৃ-গন্ধ নিতে নিতে তুহিন কেঁদে ওঠে। তার মাথার ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা, অবান্তর ভাবনার জট, ডেঁয়ো-পিঁপড়ের বিষের মতো জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

তুহিন হাঁপায়। তার চোখে-মুখে অসম্ভব রকমের কাতরতা। বাণীর বুক থেকে নেমে, পড়ার টেবিলে বসে। বইয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়ে বুঝতে পারে তার ভিতরে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। যার দিকে সে ভরসার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তা অনাবশ্যক মনে হল তার। মনে হল বাপীনের সমস্ত অধিকার যেন ছিনিয়ে নিতে চাইছে কেউ। অথচ মাসিমণির শান্ত মুখশ্রী বড় সুন্দর।

বাণী চা করে এনে বিমর্ষ তুহিনের মাথায় হাত রাখে, বলে–দুর বোকা কাঁদছিস কেন? আমি আছি।

সেই রাত্রি ভেসে গেল স্বপ্ন-সুখে। তুহিন স্বপ্ন দেখল, আনন্দ জ্যোৎস্না মেখে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। দিকে দিকে ফুটেছে অজস্র কাশফুল। সাদা সাদা মেঘ হামলে পড়ছে তার উপর। আকাশে চোখ তুলে দেখলো–সাদা ডানা মেলে অজস্র পরী উড়ে আসছে। তারও যেন দুটো ডানা গজাল। সেও পরীর মতো উড়ে গেল গভীর অরণ্য প্রান্তর পেরিয়ে কোন সুদূরে। অজানা-অচেনা জায়গা দেখে বারবার হাততালি দিচ্ছে সে। হাততালির শব্দে উড়ে যাচ্ছে অজস্র বক। সাদা ডানার আকাশ সরে যেতে দেখল–একটা ধবধবে সাদা ঘরের মেঝেয় রক্তবর্ণের চাদর পাতা। ঘর ভরে আছে তুষারকণায়।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই চেনা পারফিউমের গন্ধ আচ্ছন্ন করল তাকে। সে দেখল, ড্রেসিং টেবিলের সামনে এক পরী, ফুলে ফুলে আবৃত হয়ে আছে সে। আয়নায় তার প্রতিবিম্ব! স্বপ্নের মধ্যে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। অন্ধকার। আর কিছুক্ষণ সুনসান থেকে দুটো পরীর কুস্তি শুরু হয়। লড়াই জমে ওঠে। একজন অন্যজনকে পিষে, কামড়ে-আঁচড়ে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে। আশ্চর্য! আহত পরীর মুখে এতটুকু কষ্টবোধ নেই, কাতরতা নেই। বরং মুখে তৃপ্তির হাসি।

খেলা দেখতে দেখতে গলা শুকিয়ে ওঠে তার। শ্বাসকষ্ট হয়। ভয় পেয়ে মা বলে ডেকে ওঠে।

নীরার ডাকে তুহিন জেগে ওঠে। ঘুমের ঘোরে নীরাকে জড়িয়ে ধরে। নীরা ঘুম জড়ানো চোখে তাকে দেখে। কপালে চুমু খায়। মনে মনে ভাবে বাপীনকে বলতে হবে দাদার সঙ্গে আর শোব না, দাদা বড্ড খারাপ শোয়।

–এই দাদা?

–কী হল!

–তুই এমন বিচ্ছিরিভাবে ঘুমোস। সরে শো।

তুহিন সরে শোয়।

পশ্চিমের জানালা খোলা। শেষ রাত্রি জ্যোৎস্না ঢলে পড়ছে বিছানায়। তুহিনের ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকে নীরা। ঘুমের ভিতর হঠাৎ তুহিনের ঘুমন্ত মুখ কুঁচকে যায়, এক সময় কেঁদে ওঠে।

–এ্যাই, এই দাদা কাঁদছিস কেন? স্বপ্ন দেখছিস বুঝি?

তুহিন মাথা নাড়া দেয়। তারপর বলে, তোর মায়ের কথা মনে আছে?

–নাঃ।

–আমার একটু একটু মনে পড়ে। আবছা আবছা। জানিস, আজও স্বপ্নে অনেক পরী দেখেছি। একটাকে এত চেনাচেনা মনে হচ্ছিল। ঠিক মায়ের মতো।

–কিন্তু কাঁদছিলি কেন?

–জানিস, স্বপ্ন দেখলাম। মাসিমণি আমাদের নতুন মা হয়েছে। কী কথায় মাসিমণি আমাকে খুব মার মেরেছে, এই দ্যাখ।

নীরা হাসে, বোকা কোথাকার, ওতো স্বপ্ন, স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়। আমি বলছি বাণীমাসি কখনও আমাদের মারবে না। আমাদের খুব ভালোবাসে।

আবার ঘুম নামে দুজনের চোখের পাতায়। বাইরে আলোর পাখি নৈঃশব্দের স্বরে ডাকে। ডেকে যায়। একটা শুভ্রতার ভোর ঝুঁকে এল দিবাকরের সংসারে।

বাণী ও দিবাকরের বিবাহিত জীবন দশ বছরে পড়ল। জীবনের বহু ঝড়ঝাপট সামলে বড়ো দায়িত্ব মাথায়

নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে দুজনে। বাণীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ভালোবাসায় একটা নষ্টনীড় আবার তৈরী হয়েছে। সেই ছোট্ট তুহিন এখন কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে সিটিতে পড়ছে। নীরা এবছর উচ্চমাধ্যমিক দেবে। দিবাকরের ব্যবসা চলছে রমরমিয়ে। বাণীও মানময়ী স্কুল ছেড়ে একটি কলেজে পড়ায়।

দিবাকর সংসারে যেন এক সন্ন্যাসী। ব্যবসা ছাড়া কোন কিছুই বোঝে না। বাণীর ওপর সব দায়িত্ব দিয়েই সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু জীবন একই স্রোতে বয় না চিরদিন। বাঁক নিতে নিতে কোন এক অলক্ষ্যে পৌঁছয়।

বাণীর সংসারে আজ অজস্র ঘূর্ণির সংকেত। সে কিংবা দিবাকর কেউ একবারও টের পায়নি কখন কীভাবে একটা ঘুণপোকা তাদের সুস্থ সংসার কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। টের যখন পেল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কাল-বৈশাখীর ঝাপটাকে আঁচলের আড়ালে আটকান যায় না।

বিব্রত বাণী বুঝে উঠতে পারে না ঠিক কীভাবে চললে, কী করলে ছেলে-মেয়ে, স্বামীকে খুশি রাখতে পারবে। বিয়ের তিন বছর পরই গর্ভে সন্তান এসেছিল, তুহিন ও নীরার কথা ভেবে সে সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখতে দেয়নি।

আজকাল তুহিনের আচার-আচরণে বাণী সব সময় সিঁটিয়ে থাকে। একটা অস্বস্তিকর ভয় কাঁটার মত তাকে বিঁধে। সে না পারছে গিলতে, না পারছে ফেলতে। তুহিন তার প্রাণ, জীবনের আলো, সেই তুহিন তার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলেই খেঁকিয়ে ওঠে। তুহিনকে খুশি করার জন্য হাজার চেষ্টা করেও তার মনের হদিস পায় না সে। তার আচরণে বড় কষ্ট পায়। দিনের পর দিন ভীষণ বদলে যাচ্ছে তুহিন। ওর চোখে-মুখে রাজ্যের ঘৃণা। ছেলের বদলে যাওয়া দেখে ভাবে, তবে কী ব্যবহারে কোন খুঁত আছে, ভালোবাসার কোথাও ঘাটতি আছে! আগের মতো ভালোবাসা দিতে পারছে না সে। ছেলের চুপচাপ থাকা, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠাটা তাকে কেবলই আহত করে।

সময় থাকতে দিবাকরকে সবকিছু বলা দরকার ভেবেও বলতে পারল না সে। কী জানি–দিবাকর সমস্যাটা কী চোখে দেখবে। হয়ত তুহিনের প্রতি রাগে ফেটে পড়বে। নয়ত তার প্রতি সন্দেহ করে বলবে, তোমার জন্যই ছেলে অমন বেয়াড়া হয়ে গেছে, কিংবা এমনও হতে পারে, সব শুনে দিবাকর হয়ত বলবে, আসলে তুমি ওকে ভালোবাসো বলেই একটুতে তোমার ওপর ও এত অভিমান করে।

দুহাতের আড়ালে প্রদীপ কতক্ষণ আর জ্বলে। আঙ্গুলের ফাঁক গলে যে কোন মুহূর্তে বাতাস ঢুকে পড়ে, প্রদীপ নিভে যায়। বাণীর মমতার প্রদীপ নিভে গেল। তুহিনকে নিয়ে গড়া স্বপ্নের মিনার তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

তুহিন যে কোচিং-এ পড়ে তার স্যার মহীতোষ বাবুর সঙ্গে দেখা হতেই বললেন–আপনারা কী ভাবেন ছেলে কোচিং ক্লাসে ভর্তি হলেই পাস করে যাবে। অমন ভেবে থাকলে পাঠাবেন না। ছেলের সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন?

–কেন স্যার, তুহিন কি খুবই অন্যায় কিছু করেছে?

ছেলে এলে তো অন্যায় করবে। এ মাসে মাত্র দুদিন পড়তে এসেছে। আমি টাকার জন্য খুব একটা পড়াই না। ছেলে যদি ঠিকমতো পড়তে না আসে আর পাঠাবেন না। শুনেছি বদ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, সিগারেট ফুঁকছে।

বাণী ভাবে, তুহিন প্রতিদিন নিয়ম করে বাড়ি থেকে বের হয়। প্রতি মাসের টিউশন ফি চেয়ে নেয়। আশ্চর্য! নিজেকে একটু সামলে জিজ্ঞাস করল, আপনার ফি ঠিকমতো পেয়েছেন?

–এ মাস নিয়ে পাঁচ মাস বাকি। টাকার কথা যাক্। ছেলেকে দেখবেন তো?

বাণী ভাবে, তার অনুমান মিথ্যে নয়। তুহিন অনেক নীচে নেমে গেছে। মিথ্যে বলে আসছে তাকে। ফিরতে দেরি করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেই বলছে, বাড়তি ক্লাস ছিল, রাস্তায় গণ্ডগোল, নানান ফিরিস্তি। বকাঝকা করলেই কথা বন্ধ।

মহীতোষ বাবুর কাছ থেকে শুনে মনটা তেতো হয়ে গেল। দরদর করে ঘামতে থাকল সে। কোনরকমে ওখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন তার মাথার কোষে কোষে ছেয়ে আসে, তুহিন তাহলে কোথায় যায়, কী করে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, সব জানা দরকার। দিবাকরকে সবকিছু খুলে বলাও প্রয়োজন।

বিষণ্ন মন নিয়ে রাস্তা হাঁটছিল বাণী। হেঁটে আসছিল মানিকতলা ব্রীজ ধরে। হাঁটতে হাঁটতে ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ল। ভোরবেলা কোঁচড় ভর্তি করে বকুল ফুল কুড়াতো সে। বাড়ি আসতে হত একটা নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে। সাঁকোতে উঠলেই তার হাত-পা কাঁপত। প্রায় দিনই কোঁচড় থেকে পড়ে যেত বকুল। সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে দেখত, ভাটার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে বকুল। বকুল দিয়ে কোনদিনই মনের মতন মালা গাঁথতে পারেনি সে। কোন না কোনভাবেই হারিয়েছে সব। তবে কী তার স্বপ্নের বকুল আজও এমনি করেই হারাবে।

ব্রীজের ঠিক মাঝামাঝি এসে পাশের বিল্ডিংয়ের জি ব্লকের মিঃ প্রধানের স্ত্রী শ্যামলী দেবীর সঙ্গে দেখা। মোটাসোট ভদ্রমহিলা প্রায় তার পথ আগলে দাঁড়াল। ভদ্র মহিলার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা তার ভালো লাগল না। সে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল–কী ব্যাপার!

–চিনতে পারছেন না!

–চিনবো না কেন? আপনি আমাদের সামনের ব্লকেই থাকেন তো?

–ঠিকই ধরেছেন। ভালই হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। শুনুন, দিবাকর বাবুকে আমরা বহুদিন থেকেই চিনি, তার ছেলে কী না এমন বাজে হয়ে গিয়েছে।

–কী বলছেন।

–ন্যাকা সাজবেন না। ছেলে-মেয়ের সম্পর্কে কোন খোঁজখবর রাখেন? আর আপনিই বা কী করবেন। আপনি তো ওদের সৎমা।

মনে হল একঝাঁক পাথর তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। রক্ত ঝরতে থাকল তার। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সে, চুপ করুন, এভাবে বলবেন না প্লিজ।

–কেন বলবো না, ছেলে বাউণ্ডেলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা নয় তাই করে চলেছে।

–কী করেছে তুহিন? বাণী শক্ত হয়।

–কী করেছে? দিবাকর বাবুকে বলবেন তাঁর ছেলের জন্য আমার মেয়ে স্কুল যেতে পারছে না। বাঁদরটা আমার মেয়েকে চিঠি লেখে। প্রতিদিন পিছু নেয়। এই দেখুন না, আজ সকালে জানালা দিয়ে এই চিঠিটা ছুঁড়ে দিল, ভাগ্যিস আমার হাতে গিয়ে পড়ল। স্কুল থেকে বেরিয়ে ওরা সিনেমা রেস্টুরেন্টে ঘুরে বেড়ায়। আমি তো মহাবিপদে পড়েছি। কী করব নিজেই বুঝতে পারছি না।

আর শুনতে চাইছিল না বাণী। তার অসহায় লাগছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝাঁকুনি খায়। অসহায়ের মতই শ্যামলীর হাত ধরে বলে, না, না। এখন আপনি ওর বাবাকে কিছু বলবেন না। এই ক'দিন আগে স্ট্রোকের মত হয়েছে। অসুস্থ। এতবড় ধাক্কা বোধহয় সামলাতে পারবে না। আমি ছেলেকে বারণ করে দেব।

–আপনার বারণ শুনলে তো। কতটুকু খোঁজ রাখেন ওর। আপনার ছেলে আবার মস্তান। ওর বন্ধু-বান্ধব সবাই বখাটে। মদও খায়। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে।

মহিলার ঝাঁঝালো কথার তিরবিদ্ধ হয়ে বাণীর যেন বাকরোধ হয়ে যায়।

শ্যামলী দেবী শেষ কথা বলেন, ও রকম ছেলেকে জব্দ করতে আমি জানি। আমি মেয়েকে শাসনে রাখব, ছেলেকে আপনি শাসনে রাখুন।

ঘেমে ওঠা মুখ আঁচলে মুছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বাণী। পা যেন পাথর। তুলতে পারছে না। মনে মনে ভাবে, এত কম বয়সে ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়েছে। ভাবা যায় না। বাসে-ট্রামে, পার্কে, অলিতে-গলিতে এ প্রজন্মের

ছেলেমেয়ের হাঁটাচলা, কথাবার্তা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে কিংবা কান খাড়া করে শুনলে বোঝা যায়, কতটা অ্যাডভান্স ওরা। কোন আড়ষ্টতা নেই, লজ্জাবোধ নেই, তুই-তোকারি, হাত ধরে জড়িয়ে চলা, সবই যেন গর্বের বিষয়। বয়সের ধর্ম বলে কী আত্মসম্মানবোধ থাকবে না?

নীরার কথা ভাবতে গিয়েও চমকে ওঠে। নীরাও কি গোপনে কারও সঙ্গে প্রেম করছে। হতে পারে। নিজের বিগত জীবনবোধ দিয়ে দেখলে কী চলবে। চোখ কান খোলা রেখে এখন থেকে দেখতে হবে। বুঝতে হবে। প্রেম তো আর ঢাকঢোল পিটিয়ে আসে না।

ফেরার সময় সে ইচ্ছে করেই জি-ব্লকের পাশ দিয়েই ফিরল। মিঃ প্রধানের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দেখল, জানালায় দাঁড়িয়ে শ্যামলীর মেয়ে শ্যামা চুল বাঁধছে। সে অনেকক্ষণ ধরেই মেয়েটিকে দেখল। পছন্দ হল তার। সারল্য মাখানো মুখ। মায়াময়, লাবণ্যবতী। তুহিনের পছন্দ আছে বলতে হবে।

ওদের জানলার কাছাকাছি এলে শ্যামার চোখাচোখি হল। শ্যামা যেন যেচে কথা বলল, মাসিমণি ভালো আছেন?

শ্যামার হঠাৎ কথা বলাতে বাণী মুখে গাম্ভীর্য নিয়েই হুঁ বলে জোরে হেঁটে নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

ফ্ল্যাটের জানালায় নীরা দাঁড়িয়ে। নীরাকে দাঁড়াতে দেখে আশে-পাশের জানালায়, রাস্তায়, দূরে বারান্দায়, চারদিকে সন্ধানী চোখ বুলিয়ে দেখল, নীরাকে কেউ দেখছে কী না, কিংবা কারও সঙ্গে ইঙ্গিতে কথাবার্তা বলছে কী না! তেমন কিছু চোখে এল না। দূর আকাশে একটা চিলের ডানা মেলে ওড়ার দিকে তার আত্মমগ্ন দৃষ্টি বুঝতে পেরে স্বস্তি পেল সে।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়ের চোখ-মুখের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করল সে। তেমন কিছুই পেল না। কোথায় যেন পড়েছিল– মনের ও শরীরের সমস্ত অপরাধের ছায়া পড়ে মুখে। নীরার শরীর থেকে অন্যরকম গন্ধ খুঁজতে খুঁজতে জিজ্ঞাসা করল– তুহিন ফেরেনি?

–না।

–এখনও ফিরল না! কোথায় যে যায়।

নীরার কোন উত্তর নেই। মাসখানেকের উপর থেকে এ সংসারে তিনটি প্রাণীর ঠাণ্ডা লড়াই দেখতে দেখতে সেও বুঝে গেছে। কিন্তু আজকে মায়ের চোখ-মুখের ভাব দেখে বড় ভাবনায় পড়ে সে। সে জানে, দাদাকে নিয়ে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। তা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে। যে কোনদিন একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। বাপীন ফিরে এলে বাড়িতে যে কুরুক্ষেত্র শুরু হবে তাতে সন্দেহ নেই। আগামীকাল বাপীন ফিরবে।

মায়ের কপালে ভাঁজ দেখে নীরা বুঝল, মা ভীষণ রেগে আছে। মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হচ্ছিল না।

বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ গায়ে-মাথায় জল দিল বাণী। বুকে বড় জ্বালা, শ্যামার মা তো সত্যি কথাই বলেছে। সৎমা শব্দটা তখন তার কানে বাজছিল। সে দশ বছরের মধ্যে একবারের জন্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেনি, তবু এ সত্যি মোছার নয়।

বাথরুমে থাকতে থাকতে ডোর-বেলের শব্দ শুনল সে। আর সারা শরীর জুড়ে রাগ দপ করে জ্বলে উঠল।

নীরার দরজা খোলার সঙ্গে গলার শব্দ পেল–ও আপনি, আসুন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাণী দেখল, নীরার গানের দিদিমণি এসেছেন।

নীরা ওই গানটা আজ গা-তো! বাণী ঘরে ঢুকে বলল।

–কোন গানটা?

–জেনে-শুনে বিষ করেছি পান।

–একই গান কতদিন শুনবে?

দিদিমণি হাসল, গাও না।

–বড় ভালো লাগে রে। তোর গলায় গানটা আরও ভাল লাগে।

প্রথমে দিনিমণি, তারপর নীরা গাইল গান। গানটা শুনতে শুনতে তার দু'চোখে জল এসে গিয়েছিল। বাণী দিদিমণির জন্য চা করতে গেল। দিদিমণিকে চা দিয়ে তুহিনের পড়ার ঘরে ঢুকে বইপত্তর ঘাঁটতে থাকল। বইয়ের মলাটের ভিতরে, খাতার ভাঁজে প্রেমপত্র লুকিয়ে রাখে। পেয়েও গেল। অনেক মেয়ের ছবি। তবে কোনটাই শ্যামার নয়।

ছবি দেখতে গিয়ে 'তুহিন বড় হয়ে গেছে' টের পাওয়ামাত্র একটা ভয় তাকে জড়াল। যেন আগুনের স্পর্শ পেল সে। তুহিনের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস যেন নেই তার। ফটোগুলো যথাস্থানে রেখে সে হাঁপায়। দেরাজের ভিতরে অনেক প্রেমপত্রের সঙ্গে শ্যামার ছবি। চিঠির কয়েক লাইন পড়ে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। এত হৃদয়ের কথা জানে এরা!

ও-ঘর থেকে নীরার গলা এল–মা, দিদিমণি চলে যাচ্ছেন!

দিদিমণিকে দরজা খুলে দিতে গিয়ে নীরা দেখল, তুহিন দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে। বলল, কীরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছিস। ডাকছিস না যে।

–ডাকার আগেই দরজা খুলে গেল।

–ও।

ঘরে ঢুকেই তুহিন বাথরুমে গেল। জল পড়ার শব্দ হচ্ছে জোরে জোরে।

মায়ের পাশে বসে নীরা বলল–দাদাকে কেমন যেন লাগছে!

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকেই তুহিন বলল, কলেজ থেকে কোচিং ক্লাসে গিয়েছিলাম, ফেরার পথে বুলান ডেকে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে। তাই এতটা দেরি হল।

–তুমি আজ ক্লাস করেছ?

–হ্যাঁ।

–স্যারকে মাইনে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

–কেন মিথ্যা বলছ, বলতে পারো, এতে তোমার কী-ই বা লাভ হচ্ছে।

–কী, মিথ্যা বলছি?

–চুপ, একেবারে চুপ। আর একটা শব্দ করলে এক চড়ে মাথা ভেঙে দেব। মিথ্যুক কোথাকার। নিজেকে সামলাতে পারল না বাণী। ক্রোধে অন্ধ হয়ে তুহিনের গালে সপাটে চড় মারল– মিথ্যুক, ডাহা মিথ্যুক। এভাবে দিনের পর দিন আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ। মাস তিনেকের বেশি কোচিং-এ যাচ্ছ না। স্যারের টিউশন ফীও দাওনি। মস্তানি কর, জুয়া খেল, মদ খাও। আর এগুলো কী! বলতে বলতে দেরাজ থেকে প্রেমপত্রগুচ্ছ নিয়ে এসে তুহিনের গায়ে ছুঁড়ে মারে–বল, বল এগুলো কি মিথ্যে। সব মিথ্যে! আর একটা চড় মারল বাণী। উত্তেজিত হয়ে দু'হাতে সর্বশক্তি দিয়ে তুহিনকে ঝাঁকুনি দিল।

চিঠি ও ছবিগুলো কুড়োতে কুড়োতে তুহিন অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বলল, আমার দেরাজে হাত দেওয়ার সাহস হ'ল কী করে?

তুহিনের কথা শুনে বাণী রাগে ফেটে পড়ে বলল–কী, আমায় সাহস দেখাচ্ছ! সত্য বেরিয়ে পড়েছে খুব আঁতে লাগছে তাই না? বলেই তুহিনকে সর্বশক্তি দিয়ে পুনরায় মারতে শুরু করল। বাণীর হাতে মার খেয়ে তুহিন প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করল না।

নীরা ছুটে এসে মাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারল না। বাণী উত্তেজনায় হাঁপায়। তুহিনের জামা ধরে টেনে তার পায়ের কাছে বসে কাঁদতে থাকে।

তুহিনের চোখে আগুন।

সে আগুন ভয় পায় না। বেদনায় কান্না জড়ান গলায় অনুনয়ের স্বর, কেন, কেন অমন তুই। এমনভাবে মানুষ হবার জন্যেই কী নিজের সবই উজাড় করেছি। আমি না হয় তোর কেউ নই। বাপটার কথা ভেবে দ্যাখ। যে মানুষ তোদের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছেন, আর শেষে কী না তাকেই ফাঁকি দিচ্ছিস।

তুহিন পাথর।

মার খেয়েও ছেলেটার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। ছেলের চোখে বন্যতার ছাপ। বাণীর ভেতরে কে যেন বলে উঠল, এ কী করলে বাণী, এ তোমার বাড়াবাড়ি। তুমি ওর মা হয়ে উঠতে পারবে না কোনদিন। তাছাড়া লোকে যখন জানবে, অতবড় ছেলের গায়ে তুমি হাত তুলেছ, তারা এই সামান্য ঘটনাকে বড় করে দেখবে। কেউ বিচার করবে না তোমার মানসিকতা। সবাই বলবে সৎমা বলেই পেরেছ এমন নিষ্ঠুর হতে। যে দিবাকরের প্রতি তোমার এত বিশ্বাস, সেই দিবাকরও বলবে–তোমার জন্যই ছেলেটা মানুষ হল না। অতবড় ছেলের গায়ে হাত তোলা তোমার কখনও উচিত হয়নি।

বাণী তুহিনের নীরব নিশ্চল অদ্ভুত পাথর প্রাণের কাছ থেকে পালিয়ে এল ঘরে।

দশ বছরের মধ্যে মা-কে তাদের গায়ে কখনও হাত তুলতে দেখেনি নীরা। মায়ের আজকের আচরণে সে হতবাক। পড়ার টেবিলে গুম হয়ে বসল।

অপমানে, বেদনায় পাথর হয়ে গেল তুহিন। সে রাগে ফেটে পড়তে গিয়েও পারল না। এখুনি সব লণ্ডভণ্ড করে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েও গেল না। সোফায় মাথা নিচু করে বসেই থাকল।

অনুশোচনায় দগ্ধ বাণী। তুহিনের গায়ে হাত তুলেছে উত্তেজনার বশে। ঠিক হয়নি। এ ঘরে এসে দেখল নীরা টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে, তার চোখের কোণে জল। তুহিন সোফায় হেলান দিয়ে দু-হাতে মাথা চেপে বসে আছে। ঘুমিয়ে গেছে কী জেগে আছে বোঝা গেল না। সে নিঃশব্দে দাঁড়াল ছেলের সামনে। ওর নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে থাকল। ভাবল, তুহিনের সমস্ত কিছু বদলানো দরকার। ও নিশ্চয়ই কারো প্ররোচনায় এমন করছে। হয়ত এমন কেউ আছে যারা আমাদের পরিবারে অশান্তি আনতে চাইছে। মা-ছেলের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে তারা আনন্দ পাচ্ছে। তাদের আগে খুঁজে বের করা দরকার। ওকে ওদের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে হবে। এভাবে শাসন করলে কাজ হবে না, ভালোবাসা দিয়ে মনের কাঁটা তুলতে হবে। পরক্ষণেই ভাবল, এই আঘাতের পর ও যদি উগ্র হয়ে ওঠে। যদি প্রতিশোধ নেবার জন্যে আরও খারাপ পথে যায়। না, বাণী ভাবতে পারে না। বুকের মধ্যে কান্নার ঢেউ ওঠে শুধু।

বাণী নীরাকে ডাকল, ওঠ, রাত্রি হয়েছে খেয়ে নে।

–আজ আর খেতে ইচ্ছে করছে না মা!

–কেন?

–এমনি।

হাসল বাণী, বলল, দূর পাগলি খাবি না কেন, ভাতের উপর রাগ করতে নেই। সংসারে এসব হয়। ভালমন্দ নিয়েই তো সংসার। আমরা মানুষ হয়ে না যদি মানিয়ে নিতে পারি, তবে মানুষ-জন্মে কী লাভ।

–তা বলে তুমি দাদাকে অমন করে মারবে?

–কেন, ছেলেকে কি মায়ের শাসন করতে নেই। শাসন যে করে সেই তো সোহাগ করে। তুমি ওঠ, আমি তুহিনকে ডাকছি।

তুহিনের সামনে এসে দাঁড়াল বাণী। বাণী তার মাথায় হাত রেখে ধীরে ধীরে ডাকল–তুহিন, এ্যাই তুহিন। কোন সাড়া না পেয়ে সোফায় বসে, তার মাথাটা মৃদু ঝাঁকিয়ে আবার ডাকল– এই বাবু, ওঠো।

তুহিন সাড়া দিল না। বাণীর হাতটা সরানোর চেষ্টা করে, বিরক্তির চোখ মেলে আবার বন্ধ করে নিল।

বাণী বুঝল, তুহিন জেগে থেকেও সাড়া দিচ্ছে না, তা সত্ত্বেও তৃতীয়বার ডাকল–এ্যাই।

তুহিনের কাঠিন্য ভরা মুখে বিরক্তি–কী হল?

–খেয়ে নাও।

–খাব না, খিদে নেই, যাও।

–অমন করে না সোনা, ওঠো।

–দয়া দেখাচ্ছ?

–অমন করে বলিস না খোকা।

–একশোবার বলব, আরও জেনে রাখো এ বাড়িতে থাকব না, চলে যাবো।

–মায়ের উপর রাগ করতে নেই বাবা।

–মা! হা হা করে হেসে তুহিন পুনরায় বলল–কে আমার মা? আমার মা নেই।

বাণী হাসার চেষ্টা করে ছেলের মাথার চুল নেড়ে বলল– পাগল।

–পাগল-ই বটে। তা না হলে সব জেনেও চুপ করে থাকে!

–কী জেনেছ তুমি–

–কেন, অস্বীকার করতে পার তুমি আমার মাকে তাড়াওনি?

–আমি!

–অবাক হচ্ছ? চাপা রাগে হিস্‌হিস্‌ করে তুহিন।

বাণী কথা না বাড়িয়ে মৃদুস্বরে বলল–রাত হচ্ছে, খেয়ে নাও। একটু চুপ করে আবার বলল–তুমি অযথা আমার উপর রেগে আছো। আমার কী-ই বা বলার আছে। কী-ই বা বলবো। বাবা ফিরে এলে যা কিছু অভিযোগ তাঁর কাছেই করো। জানি, মারাটা তুমি সহ্য করছ না। কিন্তু তোমার গর্ভধারিণী থাকলে এই অবস্থায় তোমাকে মারত-ই। কেন জানো, কোন মা-ই চাইত না তার সন্তান চোখের সামনে এভাবে উচ্ছন্নে যাক। অমানুষ হয়ে উঠুক। ভেবে দেখ, তুমি যা করে চলেছ, এগুলো কী ঠিক। আমার উপর রাগ করে নিজেকে নষ্ট করছ কেন? তুমি বড় হচ্ছ, সত্য-মিথ্যা যাচাই করে বাস্তবকে মেনে নাও।

–কার সঙ্গে কী তুলনা করছ? মায়ের যোগ্য তুমি নও।

–ছিঃ খোকা, অমন করে বলতে নেই। যোগ্যতা-অযোগ্যতার কতটুকু বোঝ। রাগে এখন যা বলছ তার জন্য পরে অনুশোচনা হবে। ছাড় ওসব, চল খাবে।

তুহিন কোন শব্দ করে না।

–তুমি না খেলে আমিও কিন্তু খাব না। নীরাও না খেয়ে বসে আছে।

–তোমরা কেন খাবে না?

–বাঃ ছেলে না খেলে মা কি খেতে পারে? তোদের না খাইয়ে আমি খেয়েছি? নে ওঠ।

তুহিন নীরবে বাণীর মুখ দেখতে লাগল। সে টের পেল বুকের ভিতর কী যেন ভাঙছে। আঘাতটা ফিরে তাকেই জোরে আহত করছে। কান্না পেতে থাকল তার।

তুহিনের চোখ ভিজে উঠতে দেখে বাণী বলল–কেঁদ না। তুমি কাঁদলে আমার কষ্ট। আমাকে বোঝার চেষ্টা কর। তোমাদের মানুষ করা ছাড়া আর কোন স্বপ্ন নেই আমার। তোমরা ছাড়া আমার কে আছে বল। সন্তানের ভিতরে বেঁচে থাকতে সব বাবা-মাই চায়। তোমার ধ্বংস যে আমি কোনদিন সইতে পারব না বাবা। আমার কথা না-ই ভাবলে, তোমার মায়ের কথা ভেবেই তোমার সংযত হওয়া উচিত। পড়াশুনায় মন দাও। নিজেকে তৈরী করো। বলতে দ্বিধা নেই। প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে জীবন। ভালোবাসার সূক্ষ্ম টানে কী অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে চলছে সংসার। বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মিলন। কথাগুলো কেন বলছি বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না তোমার। নিজেকে তৈরী করলে শ্যামার মত বহু মেয়ে তোমার জীবনে আসবে। পদস্খলন হলে কেউ ফিরেও তাকাবে না।

শ্যামার প্রসঙ্গে তুহিন লজ্জা পায়। চোখ তুলে বাণীর মুখ দেখে।

বাণী তুহিনের শীতলতা ছুঁয়ে বলল–আমাকে না হয় অস্বীকার করলে, কিন্তু বাবার কথা ভেবে নিজেকে শুধরে নাও।

তুহিনের বুকের ভিতর তোলপাড় শুরু হল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বাণীর কথা অনুভব করে বাঁচার প্রেরণা পেল যেন। আবেগে বিহ্বল হল সে।

বাণীও বুঝল সেও ভেসে যাচ্ছে আবেগে। তার বুক ভিজে উঠছে তুহিনের চোখের জলে। ছেলেকে প্রাণভরে কাঁদতে দিল সে। তার মুখ দুহাতে তুলে বলল–চুপ, আমার দিকে দেখ, কোথাও কোন অসামঞ্জস্য খুঁজে পাও কী না?

তুহিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, শব্দ করে কেঁদে উঠল। বাণী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নরম করে বলল–খাবে চল।

কিছুক্ষণ পর তুহিন কান্না মিশিয়ে বলল–আমি জানি না, কেন আমি এমন হয়ে যাই। দেশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে নরেশ কাকু, শুভঙ্কর কাকা, নমিতা পিসি, তরণী জেঠুর মুখে প্রথমে মায়ের কথা জানলাম। দু'বছর আগে জানতাম মা মারা গেছে। ওরা বলল বেঁচে আছে। আমার এক ভাই আর এক বোনও আছে। সেদিন থেকেই একটাই প্রশ্ন বারবার কুরে কুরে খায়, বাবাই বা কেন আমাদের মিথ্যে বলল! কেন আজ পর্যন্ত সেই মায়ের কথা জানাল না? তারপর শুনলাম তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাকে ডিভোর্স দিয়েছে আর তার জন্য তুমিই দায়ী। সেদিন থেকে তোমাকে সহ্য করতে পারি না। সেই জ্বালাতেই আমি যা খুশি তাই করি। বিশ্বাস করো–আমি নষ্ট হতে চাইনি, অথচ নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। তোমার প্রতি, বাবার প্রতি, এমনকি পৃথিবীর প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা। কাউকে বিশ্বাস হয় না। মনে হয় সবাই মুখোশ পরে ঘুরছে। বেঁচে থাকাও একটা নেশা, সে নেশায়ও বুঁদ হতে পারছি না।

বাণী বুঝল, তার অনুমান মিথ্যে নয়। দিবাকরের আত্মীয়-স্বজনেরাই ছেলেটার মন বিষিয়ে তুলছে। তাদের সুখের সংসার ভেঙে টুকরো করে দিতে চাইছে। বেশ কিছুদিন ধরে শুভঙ্করের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য চলছে, সে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে এভাবে।

নীরা ভাতের থালা সাজায়। বাণী তার হাত থেকে থালা নিয়ে টেবিলে রাখে। নিজের আঁচল দিয়ে তুহিনের চোখ মোছায়। সান্ত্বনা দেয়। নিজের হাতে ভাত মেখে ছেলেকে খাইয়ে দেয়।

ভাত খাওয়া শেষ হলে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে–পৃথিবী বড় জটিল, কেউ কারো সুখ সহ্য করতে পারে না। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা অন্যের কষ্ট দেখে বড়ো আনন্দ পায়।

তুহিন নিরুত্তর রইল। শুতে গেল। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। এ ঘরে এসে বাণী দেখল, নীরা শুয়ে পড়েছে। নীরার পাশে শুয়ে বাণী চোখ বন্ধ করল।

বাণীর হাতে মার খেয়ে এবং আদর পেয়ে তুহিন শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু ঘুম এল না। চোখ জুড়তেই অবচেতন মনে একটা মুখ ভেসে উঠল, বড় মায়াময়, দেবশ্রী তার রূপ। সে মেঘের পোশাকে, মেঘের ভিতর দিয়ে হেঁটে ছুঁয়ে গেল তাকে; মেঘরাণী কী অনায়াসে ধরা দিল তাকে। সে তার ক্ষতস্থানে হাত বুলিয়ে বলল, বড় কষ্ট হচ্ছে বাবা, শুয়ে পড় আমি ঘুম পাড়িয়ে দিই। তার কথায় তুহিনের বুকের ভিতর চাপা দুঃখ ও রাগমিশ্রিত যন্ত্রণা উথলে উঠল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। তার কান্নার সমস্ত জল মুছে নিল মেঘ। দূর প্রান্তরে গিয়ে হু হু করে কাঁদল সে-ও।

ঘুম ভেঙে গেল তুহিনের। বাণী-মা'র প্রতি একটা রাগ সারা শরীরে আবার ঝিঁকিয়ে ওঠে। তীব্র ঘৃণা আবার মাথা তুলল। কয়েক দিন আগে শ্যামাকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল তুহিন। ঝিকুরখালির তাদের আত্মীয় নরেশ কাকুর কাছে তার মা'র কথা শুনে এসেছে। শ্যামার হাত ধরে ফাঁসিতলার মাঠ, বিলপুকুর, দিঘির পাড় ঘুরে এসেছে। একরকম বনজ গন্ধ আজও তার নাকে অনুভব করে। নরেশ কাকু বলেছিলেন, ফাঁসিতলায় বটগাছের ভট্টাচার্যির বড় বৌকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছিল, তার বাবা দিবাকর ও তার মা সরমাকে মারতে চেয়েছিল। খুন করে বিলপুকুরের পাঁকে পুতে দিতে চেয়েছিল। মরে গেছে ভেবে জলে ফেলে দিয়েছিল। সরমা মরেনি, বরাত জোরে বেঁচে গেছে। পালিয়ে বেঁচে আছে। অনেক নারীর চাপা-কান্না ওই ফাঁসিতলার মাঠে। বিল পুকুরের জলে ছলাৎ-ছলাৎ করে কত জলপরীর কঙ্কাল। দিনমানে ভয়ে কেউ যায় না ওদিকে।

নরেশ কাকুর কথায় তুহিনকে এক অবসন্নতা গ্রাস করেছিল, সে শ্যামার হাত ধরে সারা দুপুর টো-টো করে ঘুরে বেড়িয়েছে। দিঘির জলে পা ডুবিয়ে বসে থেকেছে। হতশ্রী নারীর কান্না কান পেতে শুনতে চেয়েছে। এক অন্য রকম গন্ধও পেতে চেয়েছিল। আজও বুক ভরে পেতে চায় সেই গন্ধ।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তুহিন উঠল। সুবর্ণ আলো ছোঁয়ার মুহূর্তে সে ঠিক করল, আজ বনশ্রীনগরে তার মায়ের কাছে যাবে। মনে হওয়া মাত্রই উঠল সে। তুহিন এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। পিছন ফিরে দেখল না। দেখতে চাইলও না। ছুটতে শুরু করল সে।

বনশ্রীনগর। তুহিনের স্বপ্নের মা বাস করে। পাঁচ-ছ'বছর বয়সে দেখা মুখ কুড়ি বছরের যুবকের স্মৃতিতে ধূসর। কিন্তু একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি।

নরেশ কাকুর কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে বনশ্রীনগর খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি তার। বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। সামনের দোকানে বসে চা খেল। একটা সিগারেট ধরাল। জায়গাটা বড় নির্জন। শহরতলী। গ্রামের শিরদাঁড়া বরাবর পিচ-রাস্তা সংযোগ রেখেছে শহরের সঙ্গে। আধ ঘণ্টা এক ঘন্টা পরে পরে একেকটা বাস ছাড়ে। ছাদে ভর্তি হয়ে প্যাসেঞ্জার ওঠে। বড় কষ্ট করে এরা যাতায়াত করে। সারাক্ষণ পা-দানিতে ঝুলতে ঝুলতে পায়ে খিল ধরেছে তার। তারপর রাস্তায় যেভাবে গর্ত। বাসের ঝাঁকুনিতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবার উপক্রম।

বনশ্রীনগরে কাকপক্ষীও তাকে চেনে না। পান-দোকানে জিজ্ঞাসা করে জানল, এখান থেকে রিকশায় করে মাইলখানেক ভিতরে ঢুকতে হবে। মাটির রাস্তা। বৃষ্টি হলে রিকশা যাবে না। হাঁটতে হবে। পান-বোরোজের পাশে স্কুল বাড়ি, একটা বড় পুকুর, তার পরেই ভট্টাচার্জির বাড়ি।

চা খেয়ে রিকশায় উঠে। যতই এগুচ্ছিল, ততই তার বুকের ভিতর এক ধরনের কাঁপন আসছিল। একটা স্বপ্ন আবিষ্কার করার আনন্দে সে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। রিকশায় বসে, বাঁশির সুর কানে আসছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। পৃথিবীর শুভ প্রদক্ষিণের সময় অন্ধকার আর এই গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি তুহিনকে বিমোহিত করে তুলল। পান-বোরজের কাছে এসে রিকশাচালক জোরে হাঁক দিল—ও জয়ন্ত দা, একবার এদিকে এসো।

বাতাসে বাঁশির সুর-তোলা শব্দ থেমে গেল। পান-বোরজের পাশে শিরিষ গাছের তলায় আধশোয়া তার থেকে দুতিন বছরের ছোট এক যুবক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল–কিছু বলবে?

–দেখ-ত ইনি কাকে যেন খোঁজ করছেন। এখানে নেমে যান বাবু, ওনার সঙ্গে গেলেই পৌঁছে যাবেন।

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ছেলেটি প্রশ্ন করল–আপনি কাকে খুঁজছেন?

–এখানে প্রাণতোষ ভট্টাচার্য বলে কেউ থাকেন?

–উনি বছরখানেক হল মারা গেছেন।

–আমি ওনার বড় মেয়ে সরমা ভট্টাচার্যের খোঁজ করছিলাম।

–সরমা ভট্টাচার্য?

–হ্যাঁ।

–আপনি কোথা থেকে আসছেন?

–কলকাতা থেকে।

–আমার সঙ্গে আসুন।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তুহিন আড়চোখে দেখল ছেলেটিকে। হঠাৎ বাঁশির দিকে চোখ পড়তেই জিজ্ঞাসা করল, এতক্ষণ কী আপনিই বাঁশি বাজাচ্ছিলেন।

–হ্যাঁ, সলজ্জ হাসি ছেলেটির মুখে।

–দারুণ বাজান আপনি। সুরটা যেন খুবই প্রাণের। কোথা থেকে শিখলেন? আর একবার বাজান।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিল। বাঁশির সুরে তন্ময় তুহিন। সুর শুনে তার বুকের গভীর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে রাত্রি ধেয়ে এল। সঙ্গে বাঁশির সুর, জল-ছেঁচা মেশিনের ঢক-ঢক শব্দ। সেই বাঁশির শব্দ শুনে অন্ধকার ভরা এক পরীর নিঃশব্দ উড়ে বেড়ান। ছটফট করা। কখনও জানালা খুলে, দূর জ্যোৎস্নার বুকে নিঃশব্দ হয়ে থাকা। দৃশ্যগুলো দ্রুত এসে ধাক্কা দিল তাকে। সে মাথাটা চেপে ধরল।

তুহিনের আকস্মিক পরিবর্তনে বাঁশি থামিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল–কী হল? ভালো লাগল না বুঝি?

–না, আপনার বাঁশিতে এমন যাদু আছে। আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। কার কাছে শিখলেন এই সুর!

–বলতে পারব না। ছোটবেলা থেকে বাজানোর নেশা, আপন মনে সুর তুলি আর বাজাই।

–খুব ভালো, আপনার প্রতিভা আছে বলতে হবে। তা সরমা-দেবীকে এখন পাবোতো! আর কতদূর যেতে হবে।

–এই সামনে।

মোড় ঘুরতেই একটা টালির ছোট্টা বাড়ি চোখে পড়ল তুহিনের। ইলেকট্রিক বাতি আসেনি। প্রতি ঘরে ঘরে হ্যারিকেন কিংবা লম্ফের আলো জ্বলে উঠছে।

তুহিন দূর থেকে দেখল, সামনের টালির বাড়ির উঠোনে একটা তুলসী মঞ্চ। তার তলায় দাঁড়িয়ে বারো-চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধ্যায় প্রণাম করে লম্ফ হাতে ঢুকে যাচ্ছে ঘরে।

ঘরের সামনে একটা পুকুর। পুকুরের পাড়ে কলাগাছের সারি। পাশ দিয়ে সরু রাস্তা। রাস্তায় উঠে ছেলেটি হঠাৎ প্রশ্ন করল–সরমা দেবীকে আপনি চেনেন না-কী?

–চিনি না, চিনে নেব। উনি কী আপনার কেউ হন?

–উনি আমার 'মা'।

থমকে দাঁড়াল তুহিন। এক ভাই আছে সে শুনেছিল। তুহিন ছেলেটির হাত আবেগে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করল–তোমার নাম কী?

–জয়ন্ত। জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

ছেলেটি উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল–মা, ওমা দ্যাখো তো কলকাতা থেকে কেউ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ঘর থেকে স্নিগ্ধা মেয়েটি বেরিয়ে এসে বলল–মা ঘরেতে নেই। তমালদের বাড়ি গেছে। এখুনি এসে পড়বে।

–আপনি বসুন। আমি মাকে ডেকে আনি।

মেয়েটি ঘর থেকে হ্যারিকেন এনে তুহিনের সামনে রেখে চলে যাচ্ছিল। তুহিন তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে বলল–তোমার নাম কী?

–সুষমা।

–সুষমা! তার বোন।

আনন্দে বুকের ভিতর ভেঙে যাচ্ছিল। উত্তেজিত হচ্ছিল ভিতরে। স্বপ্নের উচ্চশিখরে পৌঁছে স্বপ্ন স্পর্শ করার আকুলতায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকল। ভিতর থেকে সম্মোহিত আলো বেরিয়ে আসছিল।

কয়েক মিনিট পরে জয়ন্ত সঙ্গে করে মাকে নিয়ে ফিরে এল। আধ-ঘোমটা মুখ। প্রতিমার মত মুখশ্রী। দুধে-আলতা গায়ের রঙ। কপালে ভ্রু ঘন, কালো চুল। মিলে যাচ্ছে, স্বপ্নের দেবীর সঙ্গে সবই মিলে যাচ্ছে!

–কে বাবা তুমি? আমি তো ঠিক চিনতে পারছি না।

আবেগে অস্থির তুহিন, উঠে গিয়ে প্রণাম করল রমণীকে।

–থাক বাবা থাক। তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

–কলকাতা, শ্যামবাজার। আমার নাম তুহিন ভট্টাচার্য। আমার বাবার নাম দিবাকর ভট্টাচার্য।

–তুহিন! তুই আমার সেই...তুহিন।

–হ্যাঁ মা। আমি সেই ছোট্ট তুহিন।

প্রায় চিলের মতো ছোঁ মেরে তুহিনকে বুকে টেনে নিল সরমা। চুমোয় চুমোয় ভরে দিল তার মুখ। তার প্রতি অঙ্গের স্পর্শে বেঁধে নিতে চাইল ছেলেকে। সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তার হারানো ছেলে দেবদূতের মতো ফিরে আসবে।

পূর্ণিমার পূর্ণ জোয়ারে বিশাল ঢেউ ভেঙে পরিপূর্ণ হল নদী। মায়ের বুকে মাথা রেখে সেই নদীর গন্ধ পেল তুহিন। তার বুভুক্ষু হৃদয়ে জেগে থাকা কষ্ট আস্তে আস্তে সরে গেল। পরম শান্তিতে তার প্রাণ জুড়ায়। এত শান্তি, এ-আনন্দ আছে এ বুকে, তার এর আগে জানা ছিল না।

তুহিনের আসার খবর ছড়িয়ে পড়েছে পাড়ায় পাড়ায়। তাকে দেখতে পাড়া ভেঙে লোক আসছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে নানান মন্তব্য তার কানে আসছিল। তাকে কেউ বলছে–আহা যেন রাজপুত্তুর। এমন সোনার টুকরো ছেলে ছেড়ে কোন মা বাঁচতে পারে! কেউ বলছে–জামাই-এর কাছে আর একটা মেয়ে আছে? সেও নিশ্চয়ই বড় হয়ে গেছে। সেয়ানা হয়েছে।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন–জামাই তো আবার বিয়ে করেছে? সৎমা তোমাদের ভালোবাসে? খেতে পরতে দেয়?

এসব প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না তুহিনের কাছে। থাকলেও উত্তর দেবার কোন দায় অনুভব করল না সে।

লোকের ভিড় কমে যেতে ছেলেকে জল-বাতাসা দিয়ে সরমা গল্প করতে বসল। বলল–হ্যাঁ, রে আমার কথা তোর মনে ছিল?

–আবছা আবছা।

–কষ্ট হতো?

–প্রথম দিকে জানতাম আমার মা মারা গেছে। অনেক পরে জানতে পারলাম তুমি বেঁচে আছ। যেদিন জানতে পারলাম সেদিন থেকে তোমাকে কতভাবে কল্পনা করেছি। ঘুমে-স্বপ্নে কত কথাই না বলেছি, তার ঠিক নেই।

–নীরা কেমন আছে রে? অনেক বড় হয়ে গেছে?

–এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক দেবে।

–সঙ্গে আনতে পারলি না?

–কী করে আনব। তোমার কাছে এসেছি একথা বাড়ির কেউ জানে না।

–কেন, বলে আসিস নি কেন?

–বলে এলে আসতে দিত নাকি?

সরমা চুপ করে যায়।

তুহিন নীরব থেকে আবার বলে–হঠাৎ একদিন দেশের বাড়িতে গেছলাম। নরেশ কাকার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম তুমি বেঁচে আছ। তার কাছ থেকে বনশ্রীনগরের ঠিকানা জোগাড় করে একাই চলে এলাম।

–ভালই করেছিস। ঘরের ভিতরে চল।

সরমা ছেলেকে ঘরের ভিতর বসিয়ে উঁচু গলায় মেয়েকে ডেকে বলল–সুষমা, দাদার সঙ্গে গল্প কর। আমি আসছি।

সুষমা রান্নাঘর থেকে জবাব দিল–যাচ্ছি।

সরমা চলে গেল। ঘরে একলা তুহিন। সে উদাসীনভাবে ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল। দশ ফুট বাই বারো ফুটের পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দু-কামরার ঘর। মাটির দেয়াল, টালির ছাউনি। ছ'ফুটের বারান্দা। সামনে বনশিল্লার বেড়া দেওয়া ফাঁকা জমি। সে পশ্চিমের ঘরটায় বসেছে। সে ওই ঘরের জানালা থেকে একটা ছোট পুকুর দেখতে পেল।

ঘরের ভিতরে তেমন কোন প্রাচুর্যের খোঁজ পেল না। একটা নড়বড়ে তক্তপোষ। তক্তপোষে মোটা কাঁথা বিছানো, বেডকভার নেই। তেলচিটে দুটো বালিশ। পূর্ব দিকের দেওয়াল ঘেঁষে বাঁশের আলনা। আলনায় কয়েকটা শাড়ি, শালোয়ার, কামিজ, কয়েকটা কাঁথা ঝুলছে। পশ্চিমের কোণে মাটির কুঁজো, চারদিকে দুঃখী দুঃখী ভাব স্পষ্ট। এখানে ওখানে পাটের তৈরী শিকায় হাঁড়ি ঝুলছে।

ইতিমধ্যে গাছ থেকে ডাব পেড়ে এনেছে জয়ন্ত। কাটারি দিয়ে কেটে গ্লাস ভর্তি করে ডাবের জল দিয়ে বলল–খাও দাদা।

–রাত্রে এসব পাড়লি কি করে?

–ছোট গাছ, হাত বাড়াতেই পেয়ে গেলাম।

সুষমা এল থালায় মুড়ি আর নারকেল নিয়ে। পিছনে সরমা। সুষমার উদ্দেশে সরমা বলল–রাখ এখানে। তারপর তুহিনের দিকে কৌতূহল চোখে চেয়ে সুষমাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল–কে বলত তুহিন?

–কী করে জানব?

–তোর আরেক বোন।

–বোন! বাঃ বেশ মজাই হল। দু-ভাই, দু-বোন। এখানে না এলে জানতেই পারতাম না।

সরমা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল–ডাব খাও।

–হ্যাঁ খাচ্ছি। সুষমাকে দাও।

–না তুমি খাও।

ঢক-ঢক করে ডাবের জল খেল তুহিন। মুড়ির থালার দিকে চেয়ে বলল–এত খাব কি করে!

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলল–এইতো ক'টা, ফিকা মারতে মারতে শেষ হয়ে যাবে। কাঁচা লঙ্কা, সর্ষে তেল দেব?

–না থাক। তুই দু-গাল নে।

জয়ন্ত দু'খাবলা মুড়ি নিয়ে চিবোতে চিবোতে পেরেকে ঝোলানো ফেলা জাল নিয়ে বলল–মা তোমরা গল্প করো, আমি দু'ছ্যাকনা জাল ফেলে মাছ ধরি। সুষমাকে ভীমের দোকানে পাঠিয়ে দিও। আমার বলা আছে। বাজার করে নিয়ে আসবে। সরমা আবার উঠে রান্নাঘরে গেল। তুহিন সুষমার সঙ্গে গল্প করতে থাকল।

–কোন ক্লাসে পড়?

–এইটে উঠে ছেড়ে দিয়েছি।

–কেন, পড়া ছাড়লে কেন?

–এখান থেকে হাইস্কুল অনেক দূর। যাতায়াতের খুবই অসুবিধা। তাছাড়া মা আর পড়তে দিল না।

–এখানে আর কে কে থাকে?

–আর কে থাকবে। ব্যস এই তিন জন।

তুহিনের প্রশ্নের মাঝে সুষমা পাল্টা প্রশ্ন করল–তোমরা বাবার সঙ্গেই থাক!

–হ্যাঁ।

–ওখানে আরেক মা আছেন? একজন দিদিও?

তুহিন মাথা নেড়ে স্বীকার করে।

–মা প্রায়ই তোমাদের কথা বলে। বাবার কথা বলে। কিন্তু নিয়ে যায় না। বাবাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে।

–আমিই নিয়ে যাব! একটু সবুর করো!

একটু থেমে তুহিন পুনরায় সুষমাকে প্রশ্ন করে–তোমাদের চলে কী করে?

চলে যায় কোন রকমে। দাদা লোকের খামারে কাজ করে। মা সেলাই করে। আমিও টুকটাক করে চালাই।

–কেন মামারা দেখে না?

–মামাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

–দাদু-দিদা কোন খোঁজ নেন না?

–উনারা গত হয়েছেন।

–এই ঘরটা কাদের?

–এই ঘরটা নিয়েই তো ঝগড়া। দাদু বেঁচে থাকতে এই ঘরটা মাকে দিয়েছিল। মামারা মানতে রাজি নয়। অনেক ঝগড়া-ঝাঁটি করে মা এই ঘর ও পুকুর ছাড়েনি।

–দেশ থেকে কেউ আসে না?

–দেশ মানে ঝিকুরখালি?

–হ্যাঁ।

মায়ের মুখে নামটা শুনেছি আমরা কখনও যাইনি। তবে ওখান থেকে মাঝে মাঝে সুরেশ কাকু বলে একজন আসে, চাল এটা আনে, চলে যায়।

সুরেশের নাম শুনে তুহিনের ভিতরটা চম্‌কাল। কিন্তু নিজেকে আটকাল! সুষমার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবল, এই বোনটির সঙ্গে চেহারায় ও রঙের সঙ্গে যদিও তাদের কোন মিল নেই। একেবারে অন্য রকম।

সুষমার সঙ্গে কথা বলে এ বাড়ির মোটামুটি চিত্র পেল তুহিন। ভাত খেতে বসে সরমা জিজ্ঞাসা করল–হ্যাঁরে নতুন মা দেখতে খুব সুন্দরী, তোদের খেতে-পরতে দেয়, ভালোবাসে? মারে-টারে না তো?

তুহিন ভাবল, সৎমা সম্পর্কিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি তাকে এসব প্রশ্নে সন্দিহান করে তুলেছে। এ-প্রশ্নের কী জবাব দেবে খুঁজে পেল না সে। কীভাবে বলবে নতুন মা তাকে ভালোবাসে না। এমন কোন আহাম্মকও উচ্চারণ করতে পারবে না তার ভালোবাসা ও ত্যাগের তুলনা হয় না। দেবীর সঙ্গে তুলনা করলেও মন ভরবে না। তার প্রতি যতটুকু বিতৃষ্ণা, তোমাকে নিয়ে তোমার জীবন; তোমার অতীতকে কেন্দ্র করে।

তুহিন মাথা নাড়ল–ভালোবাসেন, খুবই ভালোবাসেন তিনি। তুহিন যেন ভিতরের যন্ত্রণা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আচমকা প্রশ্ন করল সরমাকে–আচ্ছা মা, তোমাদের জীবনে কী এমন ঘটেছিল, আমরা কী এমন অন্যায় করেছিলাম, আমাদের ফেলে চলে এলে? এতদিনে একবারও খোঁজ নিলে না?

প্রশ্ন শুনে ভিতরে ভিতরে কাঁপল সরমা। কপালে হাত ঠেকাল–সবই কপাল।

–না মা সব সময় কপালের দোষ দিলে হয় না। তার সঙ্গে মানুষের কিছু কার্যকরণ থাকে! কপালের দোষ চাপিয়ে কথাটা এড়িয়ে যেও না। আমি কারণ জানার জন্য জ্বলেপুড়ে যাচ্ছি। নিজেকে নিঃশেষ করে এক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছি।

–কেন নতুন মা কিংবা বাবার মুখে তুমি কিছু শোননি?

হাত ধুতে ধুতে তুহিন বলে–যা শুনেছি তা বিশ্বাস করি না। তাইতো এতদূর ছুটে এসেছি। সত্যটা যে আমার জানা দরকার।

–কিসের সত্য?

–বলো ওদের কাছে তোমার সম্পর্কে যা শুনেছি তার কোনটাই সত্যি নয়। তোমার কোন কলঙ্ক নেই; তুমি কুলটা নও। আমার জন্মের কোন দোষ নেই তো?

–কী যা-তা বলছিস। এত বছর পরে দেখা, কোথায় দু-দণ্ড গল্প করবি, তা না করে কি যা-তা বকছিস বলত? আয় আমার কাছে এসে বোস।

তুহিন সরে আসে। বলে আমার সব জানা দরকার। সব সত্যিগুলো বল তুমি।

সরমা কয়েক মিনিট চিন্তা করে বলল–শোন, তোর নতুন মায়ের সঙ্গে তোদের বাবার অনেক দিনের প্রেম ছিল। ও-ই আমার সোনার সংসার ভেঙে দিয়েছে। আমাকে ঘর-সংসারহীন, বিবাগী, কুলটা বানিয়েছে।

–সত্যি বলছ মা?

তুহিনের কথায় চমকে উঠল সরমা। সেই কণ্ঠস্বর, সেই দৃঢ়তা, সেই ব্যক্তিত্ব। এই কণ্ঠস্বর তার বহুকালের

চেনা। একেবারে যেন দিবাকরের কণ্ঠস্বর।

–সত্যি! সবই সত্যি! সরমার গলায় ঝাঁজ।

–তবে আমি যা জেনেছি তার একবর্ণও সত্যি নয়? সুরেশ, ফাঁসিতলার মাঠ–ঝিকুরখালি–নরেশ কাকু...

চমকালো সরমা। সুরেশের নামটা শুনে তার সারা শরীর কেঁপে উঠল। তবু গলায় দৃঢ়তা এনে বলল–একবর্ণও সত্যি নয়। মিথ্যে, সব মিথ্যে!

–তবে বাপীন যে ডিভোর্সের কাগজপত্র দেখাল।

–কথাটা মিথ্যে নয়। কোর্ট মারফত একটা কাগজ এসেছিল। তা আমি বাবা-দাদাদের হাতে না দিয়েই ছিঁড়ে ফেলেছি।

–কেন ছিঁড়ে ফেললে! কেন ডিভোর্সের প্রতিবাদ করলে না? দেশে কী আইন ছিল না? স্ত্রী তার প্রাপ্য বুঝে নিল না কেন?

–আইন? আইনের সাহায্যে কাগজে-কলমে সম্পর্ক ত্যাগ করা গেলেও মনের বন্ধন কি ছিন্ন করা যায়? যায় না। তোমার বাবার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলে এই দীর্ঘ কুড়ি বছরে তার নামে সিঁথিতে সিঁদুর দিই। পূজো করি, ব্রত পালন করি। সম্পর্ক নেই তো কী হয়েছে। মরে তো যাইনি। ভুল বোঝাবুঝি, ঝগড়াঝাটি কোন সংসারে হয় না। তা বলে কী কেউ এভাবে দূরে সরে যায়। আসলে এসবের মূলে আমার বাবা-মা, দাদারা অনেকাংশে দায়ী। ওদের লোভ, প্রলোভন আমার জীবনকে মরুভূমি করেছে। ওদের জন্যই তোমার বাবার সামনে দাঁড়াবার সাহস হয়নি। দাঁড়াতে পারি না। দুকূল হারিয়ে আজ দিশাহীন।

তুহিন মায়ের সিঁথির দিকে চেয়ে ভাবে, হায়রে ভারতীয় নারী। জীবন নিঃশেষ হয়ে গেলেও কোন হুঁশ নেই। মৃত্যু পর্যন্ত স্বামীর চিহ্ন ধরে থাকে সিঁথিতে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে তুহিন জিজ্ঞেস করল–তোমার বাবার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?

–কোন নারী না তার স্বামীর সঙ্গ চায়।

–বাবা আবার বিয়ে করেছে জেনেও!

–পুরুষেরা যত সহজভাবে পারে, মেয়েরা অত সহজভাবে পারে না। শুধু এই দুই ছেলে-মেয়ে এবং তোদের কথা ভেবে নিজেকে ধরে আছি। নতুন করে জীবন গড়তে পারিনি।

মায়ের দুঃখ শুনে তুহিন চাপা গলায় বলে–আমার কাছে সমস্যাটা এখনও পরিষ্কার নয়। যেদিন পরিষ্কার হবে, ওদের জীবনে আগুন ধরিয়ে দেব। ওদের সুখের সংসার ভেঙ্গে তছনছ করে দেব। আমিই বাবার বিরুদ্ধে তোমার হয়ে কোর্টে মামলা করব। এতদিনের খোর-পোষ বা যা কিছু প্রাপ্য আদায় করব।

–আমার কিছুই দরকার নেই। জয়ন্ত-সুষমার জীবন সুন্দর হলেই, আমি মুক্তি নেব। সুষমার বিয়ের দেখা-শুনা চলছে, ঠিক হয়ে গেলেই...

–জান মা, এ পৃথিবী আমার কাছে বড়ো শূন্য, একা। ওখানকার সংসারে একা হয়ে থাকি। আমার ভেতর অন্যরকম অস্থিরতা। যতদিন তোমার কথা জানা হয়নি ততদিন কোন অসুখ ছিল না। যেদিন জানতে পারলাম সবকিছুই ওলোটপালোট হয়ে গেল। নতুন মায়ের মতো উদার, সহনশীল নারী কম দেখেছি। তার মমতার কাছে আমার মাথা নত হয়ে আসে। তোমার কথা জানার পর তাকে একের পর এক মানসিক আঘাত দিয়ে চলেছি, সব সহ্য করে সে আমার ভলো খুঁজছে। বাপীন বাড়ি নেই। কাল তোমার জন্য তাকে অপমান করে, তার হাতে মার খেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি। যদি সত্যি ওর জন্য তোমার এ দুর্দশা হয়, তবে ওই ঐশ্বর্য, মমতা, ভালোবাসা, সুখ সবই ত্যাগ করে তোমার কাছে থেকে যাবো। ভুলে যাবো আমার পিতৃ-পরিচয়, বংশ মর্যাদা।

সরমার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে ওঠে। দিবাকরের প্রতি এক প্রতিহিংসায় তার মন বিষিয়ে ওঠে। মনে মনে

ভাবে পেয়েছি দিবাকর, তোমাকে শাস্তি দেবার মতো একটা পথ খুঁজে পেয়েছি। আজ বিশ বছর ধরে যে পুত্র-কন্যার শোকে বুক পাথর হয়ে গেছে, তাদের একজনকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে তোমার সাজানো বাগান তছনছ করে দেব। দেখব, তুমি কেমন করে বাঁচো।

তুহিন মায়ের দীপ্ত চোখের দিকে চেয়ে অবাক হয়। তার চোখ ভরে যেন গড়িয়ে নামছে টকটকে রক্ত। বসে বসে মায়ের চোখ-মুখের অস্বাভাবিক ফুলে ওঠা রেখা পড়তে পড়তে শিউরে ওঠে।

সরমা ছেলের হাত দুটি ধরে কাতর মিনতি করে বলে–পারবি বাবা, এই বিশ বছরের আগুন নিভিয়ে দিতে। পারবি আমার সিঁথির সিঁদুর, প্রেম-ভালোবাসা ফিরিয়ে দিতে? আমাকে সরানোর সব চক্রান্ত তোর বাবার। কারও সঙ্গে আমার কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিল না।

–পারব মা পারব; তোমার সব দুঃখ মোছার জন্যই তো মাঠে নেমেছি। কথা দিলাম, সব বন্ধন ত্যাগ করে তোমার কাছে থেকে যাব, আজ থেকেই। তুমি নিষ্পাপ, পবিত্র, তোমার কোন পাপ নেই।

লম্ফের তেল শেষ হয়ে গেছে। দপদপ করে নিভে গেল। সুষমা ও-ঘরে। জয়ন্ত এখনও ফেরেনি। আকাশ-বাতাস, মাঠ-জঙ্গল, বন-বাদাড় ভেঙে তার বাঁশির সুর আছড়ে পড়ছে জানলায়। কথা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে বাঁশির সুর শোনে তুহিন। কিছুক্ষণ সুর শুনতে শুনতে বলে ওঠে–জয়ন্ত ভালো বাঁশি বাজায়, সুরটা খুবই চেনা-চেনা মনে হয়। বহুকাল আগে কোথাও যেন শুনেছি, মনে করতে পারছি না।

তুহিনের কথায় সরমার চোখের আলো দপ করে নিভে যায়। মুখটা বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। তুহিন অন্ধকারে দেখতে পেল না মায়ের কালিমা-লিপ্ত মুখ।

তিন মাস পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দিবাকর দেখল ঘর অন্ধকার। দরজায় কলিংবেলের বোতাম টিপেও কোন সাড়া-শব্দ পেল না। কিন্তু ভিতর থেকে ছিটকিনি দেওয়াতে বুঝল ভিতরে কেউ আছে। এই সন্ধ্যেবেলা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে বিরক্ত হল। বেশ কয়েকবার ডোরবেল বাজানোর পর কাজের মেয়েটি চোখ রগড়াতে রগড়াতে দরজা খুলে দিবাকরকে দেখে বলল, ওমা মেসোমশাই।

দিবাকর অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞাসা করল–কী ব্যাপার, বাড়িতে কেউ নেই বুঝি? বারান্দার আলো জ্বলছে না কেন?

–বালব কাটা।

–বদলানো হয়নি। আর সব গেল কোথায়? হাতের ব্যাগ রেখে সোফায় বসতে বসতে দিবাকর জিজ্ঞেস করল–কি হল শুনতে পাচ্ছ না।

–কেন শুনতে পাব না। সবই পাচ্ছি। কে কোথায় যায় আমাকে কি বলে যায়। বিকেলে যখন আসি তখন মাসিমণি বেরুচ্ছেন। আমাকে বলল, আমি বেরুচ্ছি, আমি না আসা পর্যন্ত যাবি না। পাশের ফ্ল্যাটের চম্পার মুখে শুনলাম, মাসিমণি তুহিন দাদাকে খুঁজতে গেছে।

–তুহিনকে খুঁজতে বেরিয়েছে? কেন কোথা গিয়েছে তুহিন?

–জানি না বাপু, আজ প্রায় দু-মাস ধরে মা-বেটায় যেন সাপে-নেউলে। হামেশাই ঝগড়া হচ্ছে। দাদাবাবু যেন মাসিমাকে সহ্য করতে পারছে না। খায় না, দায় না। যখন-তখন বাড়ি ফেরা! আরও কত কী। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। সৎমা কখনও কী মা হতে পারে গা।

–বান্টি, কী যা-তা বলছিস?

–কেন বলবুনি। অতবড় ছেলের গায়ে হাত তোলে কোন আক্কেলে? কাল কী মারটাই না মারলে! নিজের মা হলে কী অতবড় ছেলের গায়ে হাত তুলতে পারত। না এমনভাবে বলত, যা ঘর থেকে বেরিয়ে যা। তবুও দাদাবাবুর সহ্য বলতে হবে। মুখে একটা রা-করল না।

দিবাকর অবাক হয়ে জিজ্ঞাস করল–কী হয়েছে ভালো করে বলত?

–কী আর হবে। ছেলে-মেয়ে বড় হলে একটু-আধটু উল্টা-পাল্টা করে। বয়সের ধর্ম কি আটকানো যায়? দাদাবাবু বাইরে কি করেছে? ওই যে জি-ব্লকের সান্যালবাবু না কী যেন নাম ওর মেয়েকে চিঠি দিয়েছে। তাই নিয়ে এক কাণ্ড। এসব তো আজকাল আখছার হচ্ছে। তা বলে ছেলেকে এমনভাবে মারতে হবে। মার খেয়ে দাদাবাবু ভোরবেলা কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদ-কাঁদ সুরে বান্টি আবার বলল–ও ছেলে আর ফিরবেনি, দেখে নিও।

দিবাকর বুঝল, বাণীর সঙ্গে তুহিনের কোন কারণে ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু বাণীর সঙ্গে ছেলের ঝগড়ার ঘটনা বিশ্বাসই করতে পারে না সে। দশ বছরের ব্যবধানে যে মা ছেলের গায়ে কোনদিন হাত তুলেনি, সে ছেলের গায়ে হাত তুলবে এটা কল্পনাও করতে পারল না। নিশ্চয়ই তুহিন বড় ধরনের কোন অন্যায় করেছে।

দিবাকর জামা-কাপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢোকার মুখে বলল, একটু চা কর, খেয়ে বেরুব।

স্নান করে ঠাণ্ডা হল দিবাকর। শূন্য ঘরখানায় চোখ বুলাতে বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল তার। পুরানো ব্যথার মতো যন্ত্রণা বুকের ভিতর চিনচিন করল। এভাবেই একদিন তার সাজানো ঘর ভেঙে গিয়েছিল, সেই শূন্য ঘর কী কঠোর পরিশ্রম ও ভালোবাসা দিয়ে বাণী সাজিয়েছে। সে বাণীর অভাবে ঘরটা একেবারে শূন্য লাগছে। তার জীবনের স্বপ্ন বলতে তুহিন ও নীরা, এই অবলম্বন হারালে আর কি-ই বা থাকল?

বান্টি চা দিলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে নিজেকে প্রবোধ দিল, কোথায় আর যাবে? হয় দেশের বাড়ি, নয়ত কোন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি। রাত্রির মধ্যেই ফিরে আসবে।

চা খেয়ে ডাঃ ঘোষের চেম্বারে ফোন করল। তিনবার চেষ্টার পর ফোনে ডাক্তারকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল–হ্যালো, ডাঃ ঘোষ!

–কে বলছেন?

–আমি দিবাকর ভট্টাচার্য। আপনার কাছে বাণী গিয়েছিল?

–হ্যাঁ, এসেছিল। তুমি কখন ফিরলে?

–কিছুক্ষণ আগে।

–শোন, ওরা দেশের বাড়িতে তুহিনের খোঁজে গেছে। আজই ফিরে আসবে। এত করে বারণ করলাম। ছেলের রাগ কমলে একলাই বাড়ি ফিরবে। বাণী শুনল না। বলল, 'না, দেখেই আসি'।

–ধন্যবাদ, ছাড়ছি।

–ধন্যবাদ।

ফোন রেখে তুহিনের গন্তব্য স্থানগুলো চিন্তা করে ঘর থেকে বেরুল দিবাকর। ঘড়ি দেখল ছ'টা দশ। সাতটার আগে কলেজ স্ট্রিটে পৌঁছতে হবে। সাতটা দশে কলেজ স্ট্রিট পৌঁছে সরকার বাবুকে জিজ্ঞাস করে জানল, তুহিন কোন টাকা-পয়সা নেয়নি।

দোকান থেকে বেরিয়ে সম্ভাব্য স্থানগুলো দেখে রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দিবাকর দেখল, বাণীরা এসে গেছে।

দরজা থেকেই বাণীর ঝাঁঝালো গলা শুনল দিবাকর। বাণী, হয় নীরা কিংবা কাজের মেয়েটির ওপর ঝাল ঝাড়ছে। তার ভিতরে একটা রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

বাণী এসে দিবাকরের সামনে দাঁড়াল। দিবাকর তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল–কি হয়েছে?

দিবাকরের অস্থিরতা দেখে বাণী বলল, বসো বলছি। কয়েক মিনিট চুপ থেকে ঘুরে এসে স্বামীর পাশে বসল। কথা বলল না।

বাণীকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। একদিনেই ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেছে। চোখ-মুখ শুকনো। হাঁটার শক্তিও যেন

হারিয়ে ফেলেছে। পরাজিত সৈনিকের মত বিধ্বস্ত বাণীকে দেখে দিবাকর ভাবতে বসল–সে একা গোটা সংসার মাথায় করে রেখেছে। সব ঝড়-ঝাপটা সহ্য করছে। কখনও কোন অন্যায়ের আপোষ করেনি। আজ কেন সে ক্লান্ত। কী এমন ঘটনা ঘটেছে, তা জানার জন্য দিবাকর অস্থির হয়ে উঠল। সে ক্লান্ত বাণীর দিকে চেয়ে নরম কণ্ঠে বলল–তুহিনের খোঁজ পেলে?

–পেয়েছি।

–কোথায় সে?

বাণীর নিস্পৃহ নিরাসক্ত উত্তর–বনশ্রীনগর।

–বনশ্রীনগর! দিবাকর যেন বজ্রাহত।

–চমকে উঠলে কেন?

–হঠাৎ বনশ্রীনগর গেল কেন?

–সত্য কোনদিন চাপা থাকে না। একদিন প্রকাশিত হবেই। তুমি যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যকে চাপা দিয়েছিলে, সে সত্য আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তুহিন জানতে পেরেছে, তার মা এখনও বেঁচে আছে। যেদিন থেকে জেনেছে সেদিন থেকেই সে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করেছে। নিজেকে ধ্বংসের পথে তিল-তিল করে ঠেলে দিচ্ছে। তার প্রশ্নের উত্তর দিলেও সে বিশ্বাস করেনি। তার ধারণা, আমার জন্যেই তার মায়ের জীবন নষ্ট হয়েছে। এ বিষ তার মন থেকে মুছতে পারিনি।

–এর জন্য তুমি কিছুটা দায়ী।

–আমি দায়ী, বলছ কী?

–হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই তেমন মায়ের মমতা দিতে পারনি। নিশ্চয়ই কোথাও ঘাটতি থেকে গেছে। ভালোবাসা দিয়ে তা মুছতে পারলে না।

–কী বলছ দিবাকর! তোমার মুখ থেকে এমন উত্তর আমি কল্পনা করিনি। ভালোবাসায় কোথায় কার্পণ্য ছিল, তা আমি জানি না। নিজের সর্বস্ব দিয়ে তাকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছি। তাকে আর কীভাবে ভালোবাসা দেব, আমার জানা নেই। তুহিনের প্রশ্ন ছিল খুবই মারাত্মক। তাকে সোজা করে উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। তার অবিশ্বাসকে মুছে দেয়ার মত ভাষা আমার নেই।

–অবিশ্বাস? কিসের অবিশ্বাস?

–হ্যাঁ, অবিশ্বাস। তুহিনের ধারণা, আমার জন্য তুমি ওর মাকে ডিভোর্স দিয়েছ। তোমার সঙ্গে আমার আগে থেকেই প্রেম ছিল। ওর মাকে তাড়ানোর জন্যই ওরকম ফাঁদ পেতেছিলে।

–তুহিন এসব বলেছে?

–হ্যাঁ। আমি তাকে তোমার জীবনে আসার সমস্ত ঘটনা বলেছি, তোমার মুখ থেকে শোনা সরমার সম্পর্কে যতটুকু জানি সব বলেছি। তবুও তার বিশ্বাস হয়নি। তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত অনেকভাবে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। ধরে রাখার চেষ্টা করেছি. পারিনি। বাণী মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে বলে–আমার বড় ভয় করছে, ওর চোখে যে বন্যতা দেখেছি তা ভয়ঙ্কর।

–হঠাৎ ও এতসব জানল কী করে?

–রক্তের সম্পর্ক যে!

–না, এর পেছনে কেউ না কেউ আছে।

–কে আর থাকবে। তোমার দেশের বাড়ির দিনুকাকা, শুভঙ্কর আরও অনেকে। তুহিন কলেজ থেকে পালিয়ে

প্রায় দেশের বাড়িতে যেত। সেখান থেকেই শুনেছে, তার মা বেঁচে আছে।

দিবাকরকে চিন্তিত দেখাল, বাণী বলল, আবার একটা ঝড় আসছে। সামলানোর চেষ্টা করো। আমি আর পারছি না।

–কি করে বুঝলে বনশ্রীনগরে সে তার মায়ের কাছে গেছে?

–দেশে গিয়ে শুনলাম। তুহিন ওখান থেকে ঠিকানা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছে। আর শুভঙ্করের কাছে নীরাকে লেখা চিঠি রেখে এসেছে।

–চিঠি।

–হ্যাঁ।

ব্যাগ হাতড়ে চিঠি বের করল বাণী। দিবাকরের হাতে দিলে, দিবাকর পড়তে শুরু করল।

প্রথম সম্বোধনে 'মা' শব্দটি কেটে পাশে 'নীরা' লেখা।

'নীরা', তুই খুবই অবাক হয়েছিস, হঠাৎ আমি কেন এত খারাপ হয়ে গেলাম। কেউ কী কখনও খারাপ হতে চায়? চায় না। আমিও চাইনি অথচ খারাপ হয়ে গেলাম। তুই হয়ত ভাবছিস গতকাল মায়ের হাতে মার খেয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। নারে, মায়ের মতো স্নেহ-ভালোবাসা কেউ দিতে পারবে না। ছোটবেলা থেকে আমাদের মাতৃস্নেহ দিয়ে যেভাবে মানুষ করেছেন, তার ঋণ এ জন্মে শোধ করতে পারব না। সব ঠিকই ছিল, কিন্তু যেদিন জানতে পারলাম, আমাদের মা মরেনি। তিনি আজও বেঁচে আছেন। রয়েছেন বাপের বাড়িতে। সেখানে আমাদের আরও এক ভাই এক বোন রয়েছে। সেদিন থেকে একটা ক্ষোভ আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে। একটা বিতৃষ্ণা তাড়া করে চলেছে অহরহ। শুনলে অবাক হবি, আমার বাবা আমার মাকে গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিল। মরে গেছে বলে ফেলে এসেছিল। ভাগ্যক্রমে মা বেঁচে যান। ঐ বাণী মার জন্যই বাবার সঙ্গে মায়ের ছাড়াছাড়ি। শুভঙ্কর কাকার মুখে শোনার পর থেকেই আমি ঠিক থাকতে পারিনি। তাই গতকাল মায়ের হাতে মার খেয়ে দুঃখ নয়, আনন্দ পেয়েছি।

নীরা, আমি বনশ্রীনগরে চললাম। আমাদের জনম-দুঃখী মায়ের খোঁজে। তার মুখ থেকে শোনা দরকার সমস্ত ঘটনা। যদি জানতে পারি, মায়ের নামে সমস্ত অপবাদ মিথ্যা তবে ওদের কোনদিন ক্ষমা করব না।

মাকে আমায় ক্ষমা করতে বলিস। ওর ভালোবাসার অমর্যাদা করার মতো সাহস নেই। উনি দেবী, ওঁকে প্রণাম। আমাকে খোঁজার চেষ্টা করিস না। ভালো থাকিস। ইতি তুহিন।

চিঠিটা পড়তে পড়তে দিবাকরের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। বড়ো চিন্তিত মনে হল তাকে। বাণী স্বামীর দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে বলল–অত চিন্তা করো না। ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। ওখানে গিয়ে যদি ওর মনের সংশয় দূর হয় তাতে ওর কল্যাণ হবে। তুমি তো জানো, তুমি নিজে কোন অন্যায় করোনি।

–ন্যায়-অন্যায় জানি না, একটা উচ্ছৃঙ্খল পরিবার থেকে, একজন নষ্ট মেয়েছেলের শ্বাস থেকে, ওদের দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম, যাতে এদের জীবনে ওদের ছায়াও না পড়ে। সেই জন্যই ওর মায়ের বেঁচে থাকাটা জানানোর প্রয়োজন মনে করিনি।

–তা তুমি আমি বুঝি। কিন্তু মানুষ কি অত বোঝে? একটা মিথ্যার জন্য হাজার সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মানুষ ওকে বুঝিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে।

দিবাকর গম্ভীর হয়ে থাকে, বাণী তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে–আমি জানি তুহিন কারো কথায় ভুল পথে যাবার ছেলে নয়। ও আসল সত্য জেনে নিজের বিবেকমতো ফিরে আসবে।

–আর যদি না-ই ফিরে!

–কেন ফিরবে না, ওকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছি, ওর মুখ দেখে বলতে পারি ও কি চায়। জানি ও ফিরে

আসবেই।

–ও না ফিরলে আমি যে একেবারে শূন্য হয়ে যাবো।

–একটু ধৈর্য ধরো। ভেঙে পড়ো না। জীবন যেদিকে বাঁক নিচ্ছে সেইদিকে সহজ হয়ে চলতে না জানলে বাঁকগুলো পার হতে পারবে না যে। শান্ত হও। হাত-মুখ ধুয়ে এসো।

দিবাকর সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল–তোমার ওর গায়ে হাত তোলা উচিত হয়নি। কেন তুমি ওকে আঘাত করলে!

–বড় কষ্টে। ওর নষ্ট হওয়া আমার সহ্য হচ্ছিল না। চারদিক থেকে আমি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম। মাস্টারমশায়ের সাত মাসের টাকা দেয়নি। কোচিং-এ পড়তে যেত না। কলেজ যেত না। বখাটে ছেলেদের সঙ্গে সারাদিন আড্ডা দিত। আজকাল নাকি মদ খেতে শুরু করেছিল? তুমি বলো, রাস্তা-ঘাটে লোকজন তোমাকে আমাকে অপমানজনক কথা বললে কার ভাল লাগে। এসব নানান কারণে বড় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। তাই রাগের বশে কয়েকটা থাপ্পড় মেরেছি।

চোখ বন্ধ করে দিবাকর ভাবতে থাকল। আবার একটা কালো দিন এগিয়ে আসছে সুখের সংসারে। একটা কালো বেড়ালকে যেন গুটিগুটি পায়ে রাস্তা পার হতে দেখল সে। ভাঙনের একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছে। মৃত্যুর মতন বিবর্ণ ছায়া ছায়া খেলা শুরু হবে এবার। বিগত একটা ভুল যে মারাত্মক বিষাক্ত সাপের মতন ছোবল মারবে তা সে এর আগে কখনও ভাবেনি। সে কত স্বপ্ন নিয়ে জীবনের তরী ভাসিয়েছিল। সরমা নামক এক হিমবাহ'র আকস্মিক আঘাত সব চুরমার করে দিল। ছিন্নভিন্ন জীবন নিয়ে বাণীর মতো অবলম্বন সবে পেয়ে যখন মাথা উঁচু করতে চাইছে, সাজাতে চলেছে তরণী, আবার মেঘের কালো ঘনঘটা।

বুকে ব্যথা ওঠে। মুখ বুজে সহ্য করে। কাতর শব্দ করে না। বাণীকে দোষারোপ করার মতো কোন ভাষা নেই। এ-ভাঙা সংসারের জন্য অনেক দিয়েছে সে। তাকে আর নতুন করে আঘাত দেবার ইচ্ছা থেকে সরে এসে চুপ করে থাকল। পাশ থেকে বাণী নিজেকে অপরাধী ভেবে শূন্য চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে রইল।

জানালার সামনের পেয়ারা গাছের পাতা ছুঁয়ে এক চিলতে সোনালী রোদ তুহিনের শরীর ছুঁতে ঘুম ভাঙল তার। মাটির সেঁদো গন্ধ আসতেই বিছানায় উঠে বসল সে। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিক দেখল, ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে পেল না। অনেক রাত্রি পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল নেই। মাও বিছানা ছেড়ে উঠে গেছেন। সে বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দেখল জয়ন্ত নিমডালে দাঁত মাজছে। সুষমা ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজছে, তার মাঢ়ির চারদিকে কালো রঙের আস্তরণ। মা থালা-বাসন মেজে পুকুর ঘাট থেকে উঠে আসছে। তার শাড়ির আঁচল ভেজা। মাথার খোঁপার কাছে কিছুটা ছেঁড়া।

জয়ন্ত নিমডালের একটা অংশ এগিয়ে দিয়ে বলল, এখানে তো কলগেট পাবে না, আজ ডালেই চালিয়ে নাও। কাল হাটবার। হাটে গেলে মাজন নিয়ে আসব।

তুহিন হাত বাড়িয়ে নিমডাল নিয়ে দাঁতে চাপ দিতেই তেতোয় মুখ ভরে গেল, থু-থু করে খানিকটা থুতু ফেলে বলল–কী তেতো!

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বলল–অভ্যেস নেইতো? দু-একদিন মাজলে অভ্যেস হয়ে যাবে।

তুহিনের অবস্থা দেখে সুষমা হেসে উঠতেই তুহিন বলল–নিজের মুখটা আয়নায় দেখ্ না, তারপর হাসবি।

পাশ থেকে জয়ন্ত হেসে বলল–ঠিক যেন হনুমানের মত লাগছে।

সুষমা নাকিস্বরে জিভ বার করে ভেংচি কেটে বলল–ভালো হবে না বলছি।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সরমা ছেলেমেয়ের খুনসুটি দেখে হালকা ধমক দিয়ে বলল–তোরা সকাল বেলা কী আরম্ভ করলি বলত! জয়ন্ত তোর কাজ নেই? আজ কি কাজে যাবি না!

–হ্যাঁ, চক্রবর্তীদের তিন বিঘা হাল করার কথা? কি জানি হবে কিনা, ওদের বাঁ-আলি বলদটা পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে, যাই একবার ঘুরে আসি।

ওরা রাস্তায় নামতেই সবাই উঁচু গলায় বলল– অমনি রতনের দোকান থেকে চা খাইয়ে আনিস।

–আচ্ছা।

গতকাল আসতে রাত্রি হয়েছিল বলে বনশ্রীনগরের সবকিছু দেখা হয়ে ওঠেনি। জয়ন্তর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে বুঝল রাস্তা স্যাঁতসেঁতে। ভোর রাতের দিকে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ওদের বাড়ির থেকে মাটির রাস্তা গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তায়। রাস্তায় দাঁড়াতেই তুহিন দেখল, গাছ-পাতার ফাঁকে পূর্বদিক রাঙিয়ে বিশাল সূর্য উঠেছে। সকালের কচি রোদ গাছপালা, উঁচু শিরিষ ও তাল, হাবলের পাতা ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সামনের মাঠে। পৃথিবী জুড়ে অন্যরকম অনুভূতি। মাটির সেঁদো গন্ধ পেয়ে তুহিন পিছন ফিরে দেখতে গিয়ে দেখল, সুষমা মালসা করে কুঁড়ো আর ভাতের ফ্যান কাদা কাদা করে মেখে পুকুর ঘাটে বসিয়ে মুখ দিয়ে উদ্ভুত শব্দ করে ডাকছে, আয় আয় চই চই। হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে সুষমার ডাকে সাড়া দিয়ে তীর বেগে ভেসে আসছে ঘাটের দিকে। একটা মোড় ঘুরেই জয়ন্ত থমকে বলল– দাদা পুকুরে মুখ ধুয়ে নাও?

–এই জলে? কেন চাপা কল নেই?

– আছে, সেই স্কুল বাড়ির মাঠে। অনেকটা যেতে হবে।

তুহিন দেখল, সকালে অনেকেই পুকুর ঘাটে মুখ ধুচ্ছে। জয়ন্ত তরতর করে নেমে গেল পুকুরে। মুখ ধুয়ে গামছায় মুখ মুছে উঠে এল। তুহিনের গা ঘিন ঘিন করছিল। তবুও মুখে কিছু না বলে পুকুরে নেমে গেল।

মুখ ধুয়ে উঠে এলে জয়ন্ত একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল– দাদা ইনি হচ্ছেন আমাদের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার রুহিত হালদার। আবার পঞ্চায়েত মেম্বার। আমাদের অঞ্চল থেকে দাঁড়ান।

–ইনি?

–আমার দাদা, কলকাতা থেকে এসেছেন?

–কলকাতা, মানে তোমার বাবার সঙ্গে যে দাদা থাকে।

–হ্যাঁ।

–ভালো, খুব ভালো। তবুও মায়ের খোঁজ নিতে এসেছো। বেশ ভালো লাগছে বাবা, বেঁচে থাকো।

মাস্টার রুহিত হালদারের কথায় তুহিন বুঝল, তার পারিবারিক সমস্যাটা অনেকেই জানে।

বড় রাস্তায় উঠে জয়ন্ত একটা উঁচু পোতা বা ঢিবি দেখিয়ে বলল– দাদা, ওই ঢিবির পেছনে বাবলার বেড়, ওখানে কোথাও প্রাতঃকৃত্য সেরে এসো। বেড়ের ভেতরে পুকুর আছে অসুবিধা হবে না। আমি তমালের বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি, দেখি কাজ হবে কি না? তুমি এখানেই দাঁড়াবে, আমি এলাম বলে। তুহিন মাঠের দিকে নেমে যেতে জয়ন্ত হেসে পশ্চিম দিকে রাস্তা ধরল।

প্রাতঃকৃত্য সেরে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করতেই জয়ন্ত এল, ওকে দেখে তুহিন জিজ্ঞাসা করল– কাজ হবে না?

– না। ওদের বাঁ-আলি এখনও সেরে ওঠেনি। চক্রবর্তী গেছে হেলে গরুর খোঁজে। গরু এলে কাল থেকে হাল হবে। ভালই হল তোমার সঙ্গে আজ সারাদিন বেড়ান যাবে।

চড়চড় করে সূর্য অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। রোদের তেজ বাড়ছে। মোরাম বিছানো রাস্তা পার হয়ে আরও মাইলখানেক গেলেই পিচ রাস্তা, একটুখানি এগুলে বাসস্ট্যান্ড।

রাস্তার পাশে বড় শিরিষ আর কয়েকটা বাঁশের ঝাড়। বাঁশ ঝাড়ের ভিতর থেকে কট্‌কট করে আওয়াজ আসছিল। একটা অচেনা পাখির ডানার শব্দ, সাঁই করে উড়ে যাওয়া প্রজাপতির রঙিন ডানা মেলে ঝিঙে ফুলের উপর চুপচাপ বসে থাকা। এসব প্রাকৃতিক সুন্দর চিত্রগুলো মহাসুখে অনুভব করতে করতে জয়ন্তর সঙ্গে

হাঁটছিল সে। মোরাম পিছানো রাস্তা ছেড়ে আড়বাঁধের ওপাশে পান বোরজ পিছনে ফেলে আর একটা বাঁক ঘুরতেই জয়ন্ত সামনে কয়েক সারি গাছপালায় ঢাকা ঘর দেখিয়ে বলল– ওটাই মামাদের বাকুল।

–ওই ঘরগুলো।

–হ্যাঁ, আসলে এখান থেকে দেখেছি বলে অনেক দূর মনে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের ঘর থেকে শট্‌কাট রাস্তা আছে।

–আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

–কেন?

–কি জানি, দাদুভাই বেঁচে থাকতে থাকতে মায়ের সঙ্গে কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। সেই থেকেই ওরা কেউ কোন সম্পর্ক রাখে না। আমরা যাই মাঝে মাঝে, অবশ্য মাকে লুকিয়ে।

–মামাদের কে কে আছেন?

–মামারা তিনভাই। বড় ও মেজ মামা মা'কে একদম দেখতে পারে না। ছোটমামা একটু-আধটু খোঁজ-খবর নেয়। বড়মামা, মেজমামা আমাদের তাড়ানোর বহু চেষ্টা করেছে। আমি পঞ্চায়েত প্রধান, আরও লোকজন নিয়ে কোন রকম ঠেকিয়ে রেখেছি।

–আশ্চর্য।

–আশ্চর্যই বটে। মা'কে কিছু জিজ্ঞেস করলেই মা শুধু কাঁদে, আর বলে– সবই কপাল বাবা, সবই কপাল। তারপর কেমন চুপ হয়ে যায়। গুম মেরে থাকে। পাগলামো শুরু হয়।

–ডাক্তার দেখাসনি?

–দেখিয়েছিলাম, ডাক্তার বলেছেন, কলকাতার কোন মানসিক রোগের ডাক্তারকে দেখাতে। আর মা কিছুতেই কলকাতায় যাবে না।

মায়ের অবস্থা বিবেচনা করে তুহিন ভাবে, বড় দুঃখে বেঁচে আছে মা। সঙ্গে সঙ্গে তার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। বাবাও বাণী-মার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা দানা বাঁধে। মনে মনে বলে, কাউকে ছাড়ব না আমি। কাউকে ছাড়ব না। আর কটা দিন দেরী কর তোমাকে তোমার সর্বস্ব ফিরিয়ে দেব।

গতকাল যেখানে বাস থেকে নেমে রিকশা ধরেছিল, সেখানেই এসে জয়ন্ত পাশের চা দোকানের বেঞ্চিতে বসে বলল– রতন চা দে।

একচালা খড়ের ছাউনি দেওয়া দোকান। রতন সবেমাত্র উনোনে কয়লা দিয়েছে। কুলকুলে করে ধোঁয়া উড়ছে। চায়ের গ্লাস ধুয়ে পরপর সাজিয়ে রাখছে। রতন আড়চোখে তুহিনের দিকে চেয়ে জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করল– কে গো?

–দাদা!

–দাদা! অবাক হল রতন! তোমার দাদা আছে কখনও শুনিনি তো।

–কলকাতায় থাকে। বেড়াতে এসেছে।

চাষী লোক, বুড়ো চা-খোর লোকেরা চায়ের দোকানে বেঞ্চজুড়ে বসেছে। তাদের মধ্যে বয়স্ক একজন বেশ কৌতূহল হয়ে তুহিনের দিকে চেয়ে এক সময় ফিসফিস করে পাশের জনের কানে কিছু বলল। তুহিন বুঝল, তাকে নিয়ে আলোচনা চলছে।

জয়ন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল– চায়ের কি অনেক দেরী।

রতন বলল, না এই হল বলে!

জয়ন্ত উঠে গিয়ে কোয়ার্টার পাউরুটি নিয়ে তুহিনের হাতে ধরিয়ে বলল, খাও, দিবাকর।

–তুই খাবি না।

–না, বাড়িতে গিয়ে পান্তা খাবো।

জয়ন্ত চলে গেলে চায়ের দোকানে তুহিন একা। রতন চা করে তার হাতে গেলাস ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল– কবে আসা হল?

–গতকাল রাতে।

চা খেতে খেতে বুড়ো ভদ্দর লোকের দিকে আড়চোখে চাইল তুহিন এবং অবাক হয়ে দেখল লোকটি বিড়ি ধরিয়ে তার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। বিড়ির কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

চায়ের গেলাস রেখে উঠে আসবে কিনা ভাবছিল ঠিক তখনই ওই বৃদ্ধ তার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল– তুমি কি জামাই মানে, দিবাকরের ছেলে?

–হ্যাঁ।

–জামাই এখনও বেঁচে আছে?

প্রশ্নটার মধ্যে এমন এক সন্দেহ লুকিয়ে ছিল যাতে তুহিনের ইন্দ্রীয়গুলো সজাগ হয়ে উঠল, পাল্টা প্রশ্ন করে বসল– এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

–না, মানে আমরা জানতাম দিবাকর মারা গেছে!

লোকটাকে একটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছা ছিল তুহিনের। দূর থেকে জয়ন্তকে আসতে দেখে লোকটি সরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসল, অস্পষ্ট স্বরে বলল– কিছু মনে করো না বাবা, কথাটা শুনেছিলাম তাই জিজ্ঞেস করলাম।

তুহিন তেতো মন নিয়ে বসল গুম হয়ে। একটা অন্য রকম গন্ধ টের পেল সে। মুখে কিছু বলল না। জয়ন্ত এলে তার সঙ্গে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে তুহিন বলল– তোর অনেক কাজ। তুই বাড়ি যা আমি এদিক-ওদিক ঘুরে যাচ্ছি।

–আচ্ছা দেরী করিস না। মা ভাববে।

জয়ন্ত চলে গেলে তুহিন বড় রাস্তা ধরে অনেকটা এগিয়ে গেল। বড় ভালো লাগছিল তার। কিছুটা হেঁটে গিয়ে রাস্তার বাঁ হাতে নির্জন জায়গা দেখে সেই দিকে এগিয়ে দেখল, বড় রাস্তার পাশে সরু একফালি রাস্তা যেখানে মিশেছে তার শেষে ঝাঁকড়া একটা অশ্বত্থ গাছ। কিছু না ভেবেই সেই রাস্তা ধরে গাছটার তলায় পৌঁছে গেল সে। চারদিক শুনসান, গা ছমছমে ভাব। তুহিন পেছনের দিকে গিয়ে দেখল, একটা বড় পুকুর। জল থই থই করছে। জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন পেল না। সে আর একটু এগিয়ে পুকুরের স্নিগ্ধ জল ছুঁয়ে বসে থাকল।

জলের ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তার পায়ের পাতা ছুঁয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে ভেঙে পড়ছিল পাড়ে। এতবড় পুকুর কখনও দেখেনি সে। সূর্যকিরণে সমস্ত পুকুরের জলে মণিমুক্তার উজ্জ্বলতা। জীবনের প্রথম বাধা ধরা গন্ডির বাইরে এসে সুন্দরকে পেয়ে পরম তৃপ্তি বোধ করল সে। আরাম করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সবুজ ঘাসের গালিচায়। চারপাশের বনশ্রীর মায়াময় রূপ তার মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল, বুক ভরে শ্বাস নিল। ঠিক তখনই একটা দীর্ঘকায় ছায়া তাকে ঢেকে দিতে দেখে ঘাড় ঘোরাল সে। সে দেখল, একজন বুড়ো তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। চা দোকানের লোকটার মতন মনে হল তার।

অবাক হয়ে উঠে বসল তুহিন। বলে উঠল–আপনি!

–আমি ধীরেন সদ্দার। ওউ পুকুরের ওপাড়ে তালপাতার কুঁড়েতে আমি থাকি। এ অঞ্চলে ধীরা জেলে বলেই লোকে জানে। রাত বিরেতে মাছ ধরাই আমার নেশা। বুড়ো হয়েও ওই ব্যবসা এখনও ছাড়িনি।

তুহিন লোকটির মতলব বুঝল না। বলে উঠল– আপনি কে জানার আগ্রহ আমার নেই। কিন্তু আপনি আমার বাবার সম্পর্কে অমন মন্তব্য করলেন কেন? বাবাকে আপনি চেনেন?

–না, তাঁকে চোখেও দেখিনি কোনদিন। শুধু কৌতূহল!

তুহিন ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটির আপদমস্তক দেখে বলল– কিসের কৌতূহল?

–জীবনের।

–হেঁয়ালি করবেন না তো। সাফ সাফ বলুন।

–তার আগে তুমি সত্যি করে বল, তোমার বাবা বেঁচে আছেন?

–আচ্ছা লোকতো আপনি। আমার বাবা সম্পর্কে আমি জানব না?

–তা বটে। যদি অভয় দাও তো বলতে পারি। কিন্তু তার আগে কথা দিতে হবে এখানকার কাউকে একথা বলতে পারবে না। পাঁচ কান না করে একটা সত্য জানা তোমার পক্ষে ভালো।

–আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।

লোকটা কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর চারদিক চোখ বুলিয়ে নিচু স্বরে বলল– আজ থেকে পনের/ষোল বছর আগের ঘটনা। বিকেলে বৈশাখে ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যা থেকে মুষল ধারে বৃষ্টি। নববর্ষার জলের গন্ধে আশপাশের পুকুর থেকে কই মাগুর শোল ল্যাঠা মাছ ঝাঁক বেঁধে মাঠে উঠে আসে বলেই, বর্ষার অমাবস্যার গাঢ় আঁধারে একটা টর্চ হাতে নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছিলাম। ওই যে পিয়াল গাছ দেখছ, ওরই নিচে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচার জন্য ছাতা মাথায় দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিলাম। হঠাৎ শুনি কয়েকজন মানুষের চাপা গুঞ্জন। অন্ধকারেই টের পেলাম কারা যেন একজন মানুষকে মারতে মারতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসছে এই দিকে। তখন এদিকে রঘু ডাকাতের উপদ্রুব খুব বেশি ছিল। ভাবলাম তারই কাজ। ভয়ে চুপ করে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। মার খেয়ে লোকটা করুণ স্বরে বলছিল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি দিবাকর, সরমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওদের মধ্যে একজনের গলা চিনে অন্ধকারে হামাগুঁড়ি দিয়ে এই গাছটার উলটো দিকে এলাম। মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম ভট্টাচার্যির বড় ছেলে আর রঘু ডাকাতের এক শাগরেদ একটা লোককে পেটাচ্ছে। লোকটা মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে; ভট্টাচার্যির বড় ছেলে ফিসফিস করে বলেছিল, লাশ এখানে পড়ে থাকলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। জামাই দিবাকরকে এখানের অনেকেই চেনে, তাছাড়া সরমা জানতে পারলে আর বাঁচার উপায় থাকবে না। লাশটা এখুনি পাচার করে দূরে কোন জায়গায় ফেলে দিতে হবে।

কথাটা শুনে মাথা ঘুরে গেল। সরমাকে বহুদিন থেকে চিনি। শুনেছিলাম কী নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। ওখানে থেকে কোন রকম পালিয়ে এসে সরমাকে খবর দিই। সব শুনে সরমা বিশ্বাস করেনি। কারণ বছরতিনেক হল দিবাকর রাগ করে আসেনি। সরমা চিঠি দিয়েছিল, কোন উত্তর দেয়নি। খুব জেদাজেদিতে সরমা আমার সঙ্গে পুকুর পাড়ে এসেছিল। কিন্তু এই অশ্বত্থ গাছের নিচে এসে বোকা বনে যাই। কেউ কোথাও নেই, শুনসান।

বাড়ি ফিরলে সব শুনে সরমার বাবা প্রাণতোষ ভট্টাচার্য আমার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন, ওকে ভূতে পেয়েছে। যা। শুতে যা সরমা।

আমার কথা কেউ বিশ্বাস করল না, এমনকি সরমাও না। অথচ আমি নিজের চোখে দেখেছি, কয়েকজন লোক তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। মরার আগে সে নিজেকে 'দিবাকর' বলে পরিচয় দিয়েছিল, 'তুহিন ও নীরার' নাম করেছিল।

পরদিন আশেপাশের গ্রাম থেকে কোন মানুষের নিখোঁজ বা খুনের কোন ঘটনার খবর পাওয়া গেল না। তাছাড়া ভট্টাচার্যির বড় ছেলের চোখ রাঙানির ভয়ে সেই রাত্রির বিভীষিকার কথাটা কাউকে বলিনে। তোমারও যদি বিশ্বাস না হয় দিবাকরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।

–তাহলে মা ঘটনাটা জানেন!

–কাউকে বিশ্বাস করাতে পারি না। ভট্টাচার্যির বাড়ির কাছে আমি খারাপ। ওরা আমাকে ভয় দেখাতে শুরু করল। ...শেষে একদিন...।

লোকটি আর দাঁড়াল না। হন হন করে জঙ্গলের ভিতরে যেন পাখির মতন উড়ে গেল।

বিমূঢ় হয়ে বসে রইল তুহিন। অশ্বত্থ গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের মর্মর ধ্বনি। তুহিন উঠে এসে অশ্বত্থ গাছের নিচে সুপ্ত আর্তনাদ অনুভব করার চেষ্টা করল। গাছটির চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে।

জীবনের সূক্ষ্ম জটিলতাগুলো ধরতে পারল না সে। পাকগুলো যতই খুলতে চেষ্টা করে ততই জটিল পাকে জড়ায়। অজস্র বাঁকের ভিতর আচ্ছন্ন হয়ে বসে থেকে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর তন্দ্রার ভিতর এক রমণী কণ্ঠের ডাক শুনতে পেল সে। কেউ যেন দুহাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নেবার জন্য আকুল হয়ে ডাকছে। সেই শান্ত স্নিগ্ধ বুকে মাথা রেখে বাণী-মায়ের গন্ধ পেল সে।

জয়ন্তর ডাকে ঘুম ভাঙল তুহিনের।

–এই দাদা, ওঠ, এই ভুতুড়ে জায়গায় শুয়ে আছিস কী রে! এ যে শ্মশান। দেখছিস না পোড়া কাঠ, ভাঙা কলসি, তুই এখানে এলি কী করে? চল বাড়ি চল, মা পাগলের মতন চারদিকে খুঁজছে।

তুহিন জেগে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিক চাইল। ছুটে উঁচুপতায় দাঁড়াল। বড় পুকুরের পুবদিকে ধীরে জেলের তালপাতার কুঁড়েঘর খুঁজতে গিয়ে চমকাল। কয়েকটা গাছ বাতাসের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করল– কী দেখছিস?

–আচ্ছা ওই পাড়ে অশোক গাছের নীচে ধীরা জেলের একটা তালপাতার ঝুপরি ছিল; কোথায় গেল বলত?

–ধীরা জেলে? ও নামে তো বনশ্রীনগরে কাউকে চিনি না।

–যাঃ ফাজলামি করিস না, আমি একটু আগে লোকটার সঙ্গে কথা বলেছি।

জয়ন্ত তুহিনের রক্তজবা চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেল। অস্পষ্ট স্বরে বলল– দাদাকে ভূতে ধরেছে। রাম রাম রাম। প্রায় জোর করে তুহিনকে টানতে টানতে বাড়িতে নিয়ে গেল জয়ন্ত।

জীবনের কয়েকটা সুন্দর দিন অতিবাহিত করল সরমা। তুহিনের ফিরে আসা তার কাছে চাঁদ হাতে পাওয়ার মত ঘটনা। তার মৃত স্বপ্ন পাখির ডানা ঝাপটানোর সুরে বাঁধা হচ্ছিল ধীরে ধীরে। জীবন ও স্বপ্নের মিলিত সুর গান হয়ে উঠছিল। সরমা সেই সুরে স্নান করে। কুড়িয়ে পাওয়া মুক্তোর কণা সযত্নে লুকিয়ে রাখে।

মনে মনে আশংকা ছিল, দিবাকর হয়ত পুলিশ দিয়ে তুহিনকে তুলে নিয়ে যাবে। ভয়ে রাত্রে ঘুম হত না। দরজায় কোনরকম শব্দ হলেই ছ্যাঁৎ করে ঘুম ভাঙত তার। ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে শুত। আঁচল চাপা দিয়ে ঢেকে রাখত।

এক সপ্তাহ পর আশংকা দূর হল তার। কলকাতা থেকে কেউ খোঁজ নিতে এল না। সন্তান হারানো দিবাকরের করুণ মুখ মনে করে হাসত সে। একটা প্রতিশোধের আনন্দ পেত। কিন্তু তুহিনকে নিয়ে অন্যরকম হল সরমার। কয়েকদিনের ব্যবধানে কলকাতার প্রাণবন্ত কিশোরটি কেমন যেন মনমরা, গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। সরমা ওর দহন বুঝতে পারে না। ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। ঠিক ওর বাবার স্বভাব পেয়েছে। ভিতরে ভিতরে গুমরে মরে যাবে তবুও মুখ ফুটে বলবে না।

তাদের দারিদ্র্যের সংসারে একজন বেড়ে যাওয়ায় জয়ন্তর কাজের চাপ বেড়েছে। পরের বাড়িতে দিনমজুরি

করে কত আর পায়। তার পরিশ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে সরমা কষ্ট পায়, মনে মনে বলে, কটা দিন সবুর কর। এই ক'দিনে তুহিনের প্রশ্নের পর প্রশ্ন সরমা নাজেহাল হয়েছে। অধিকাংশ প্রশ্নই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয়ে। মাঝে মাঝে তুহিনকে ভয় পায় সে। ও কী জন্য এসেছে? তার টানে না অন্য কোন কারণে?

সপ্তাহ যেতে না যেতেই বনশ্রীনগরের নাড়ি নক্ষত্র তুহিনের জানা হয়ে গেছে। বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে টো টো করে বনবাদাড় ঘুরে সন্ধ্যের মুখে বাড়ি ফেরে। ছেলেকে শাসন করতে গিয়েও করতে পারে না। যে সরমা বাপ-ভাইদের পাশে থেকেও তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তুহিন সেই মামা-মাসী, মামাতো ভাই, সবাই-এর সঙ্গে, সবাইর বাড়িতে অবাধ যাতায়াত করে। সরমা ভয় পায়। মিথ্যের শাখা-প্রশাখার বিস্তার টের পায় সে। তুহিনের চলে আসা, থেকে যাওয়া নিয়ে লোক নানান মন্তব্য করতে শুরু করেছে।

সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ অফুরন্ত জ্যোৎস্না ঢেলে সারা পৃথিবীকে পবিত্র করে, মোহময় করে তুলেছে। কাগজি ফুলের গন্ধ ম-ম করছে চতুর্দিক। তুহিনের জ্বর জ্বরভাব দেখে সকাল থেকে ছেলেকে কোথাও বেরুতে দেয়নি সরমা। জলা-জঙ্গল, বন-বাদাড় পেরিয়ে জয়ন্তের বাঁশির শব্দ আছড়ে পড়ল। উৎকর্ণ হল তুহিন। সুর শুনতে শুনতে সে হারিয়ে গেল গভীর রাতে এক জ্যোৎস্নার প্রান্তরে। শুনতে পেল জল ছেঁচা মেশিনের ঢক ঢক শব্দ। টের পেল ছোট্ট ঘরখানায় এক রূপসীর আতর মাখা শরীরী গন্ধ; দু'টি ছায়ার শরীরী যুদ্ধ; চাপা ফিসফিস স্বর, খোকা জেগে উঠলে, 'সর্বনাশ হয়ে যাবে।' এতদিন পরে মনের ভিতরে অস্পষ্ট ছবি স্পষ্ট করে দেখতে পেল সে। বুঝতে পারল– সুরেশ কাকু এই বাঁশি বাজাত। ছোট্টবেলার বিবর্ণ ছবি আজ তাকে বুঝিয়ে দিলো তার মায়ের স্বরূপ। যে সত্য জানার জন্য সুখ-সম্পদ, ভালোবাসা সব তুচ্ছ করে এতদূর ছুটে এসেছে তা তার জানা হয়ে গেছে। বুকের ভিতর থেকে একটা রাগ বুক চিড়ে উঠে আসে তবুও নিজেকে সংবরণ করে, এটা তার স্বপ্ন মাত্র, সত্যটা সম্পূর্ণ করে জানা দরকার। অনুমান করে কোন সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক নয়।

অসহ্য যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। মায়ের হাত সরিয়ে দিয়ে বলল– সুরটা খুব মিষ্টি, খুব চেনা চেনা, তাই না মা?

চমকে উঠল সরমা। কিছু কিছু কথা কী ভীষণভাবে চাপা সত্যকে উসকে দেয়। তুহিনের কথার ভার সরমা সহ্য করতে পারল না। ছিটকে সরে গেল।

বিছানা থেকে নেমে বাইরে জ্যোৎস্নাস্নাত পৃথিবীর রূপ দেখে তুহিন বলে– যাই জয়ন্তর কাছে সুরটা শিখে নিই। খাট থেকে নেমে পায়ে চটি গলিয়ে অন্ধকারে মায়ের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করে– আচ্ছা মা তুমি ধীরা জেলেকে চিনতে? তোমাদের বাপের বাড়ির ফাইফরমাস খাটত।

–ধীরা জেলে! কেন বলতো? উনিতো প্রায় পনের ষোল বছর হল খুন হয়েছেন। বড় রাস্তার ধারে বিল-পুকুরের পাঁকে পোঁতা লাশ পাওয়া গেছল প্রায় দিন সাতেক পরে।

–তাই নাকি? সাধারণ একটা লোক হঠাৎ খুন হল কেন বলতো? তার তো কোন শত্রু ছিল না। আচ্ছা মা একটু ভেবে দেখ, খুন হওয়ার আগে উনি তোমাকে বাবার সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন, ভেবে দেখ মা।

–না, তেমন কোন ঘটনা মনে পড়ছে না। লোকটা খুন হয়েছে, শুনেছিলাম কিন্তু অত ভেবে দেখিনি। কেন তুই হঠাৎ এসব জিজ্ঞেস করছিস?

-এমনি! লোকটার সঙ্গে কয়েকদিন আগে আমার দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে। অথচ কেউ বিশ্বাস করছে না। তুহিনের কথায় সরমা অবাক হল। অদ্ভুত চোখ নিয়ে অন্ধকারের ভিতর চাইল তার দিকে।

তুহিন চলে গেলে অন্ধকারে একা সরমা। সে তুহিনের কথাবার্তায় অসংলগ্নতা লক্ষ্য করল। মনে মনে ভাবল– তুহিনের এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। গ্রামের কেউ, এমনকি তার আত্মীয়েরাও তুহিনের মনটাকে বিষিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া এখানে থাকলে ওর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ হতে পারবে না। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত পেট ভরে খেতেও পাবে না। তুহিনকে ধ্বংস করার কোন অধিকার নেই তার। ঘরের চারপাশে অন্য এক সরমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল– এ কী করছ সরমা! নিজের স্বার্থের জন্য ফুলের মতন একটা ছেলের জীবন নষ্ট করছ। ভেবে দেখছ কি, আসল সত্যটা যেদিন তুহিন জানতে পারবে সেদিন কেমন করে দাঁড়াবে ওর সামনে?

তুমি কার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছ? এখনও সময় আছে। নিজের দোষ স্বীকার করে ওকে ওর পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। তা না হলে সময় তোমাকে কোন দিন ক্ষমা করবে না!

সরমা দু'হাতে অন্ধকার সরাতে সরাতে চিৎকার করে ওঠে– না, তুহিনকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে সরমা দেখল, তুহিন জবা গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরমা তার হাত ধরে বলল– চল, ঘরে চল। অন্য রকম সরমাকে দেখল তুহিন। সেই উজ্জ্বল স্বপ্ন রমণী হঠাৎ যেন দু'খণ্ড হয়ে গেছে।

খুব ক্ষীণ কণ্ঠে সরমা বলল– এই পোড়া কপালী মায়ের কাছে কেন এসেছিস বাবা। তোকে মানুষ করার কোন ক্ষমতা আমার নেই। জয়ন্ত সারাদিন পরের বাড়ীতে কাজ করে যা পায়, তিন প্রাণীর কোন রকমে চলে যায়। সুষমা বড় হচ্ছে। ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না। তুই কলকাতায় ফিরে যা। বাবার কাছে থেকে মানুষের মতন মানুষ হয়ে ফিরিস। সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া।

–আমাকে আর ফিরে যেতে বলো না মা। আমি এখানে না খেতে পেয়ে মরব, জয়ন্তর মত মাঠে চাষের কাজ করব, লোকের বাড়ীতে জন খাটব, তবুও ওদের কাছে ফিরে যাবো না। কখনোও না।

–জেদ করিস না; জীবনটাকে যতটা সহজ বলে ভাবছিস অত সহজ নয়।

–সহজ করে দেখলে সব জিনিসই সহজ হয়। বাঁচার ইচ্ছেটাই মানুষকে বাঁচায়। সামান্য শান্তির ভিতরেও পরিতৃপ্তি পায়। তোমার কাছে যে শান্তি, ওখানে চতুর্গুণ সুখে থেকেও ওই শান্তি পাইনি।

–সেটা তোর দোষ। তোর নতুন মা সব দিয়েছিল, তুই নিসনি।

–তা যদি হয়, তার জন্য তুমি দায়ী।

–কেন বাবা, যাকে তুই চোখেও দেখিসনি, যার ছবিও তোর মনে নেই, তার জন্য তুই ওদের অসম্মান করে চলে এসেছিস। এটা কী খুব ভাল হয়েছে?

–ভাল মন্দ বুঝি না। একটা সত্যকে যাঁচাই করা যে বড় প্রয়োজন ছিল মা।

–হ্যাঁ, তাই বল বাছা, তুই এই হতভাগী মায়ের টানে এখানে আসিসনি। এসেছিস নিজের জেদের জন্য; সত্য-মিথ্যার যাচাই করতে।

–মা! এ কী বলছ তুমি?

–ঠিকই বলছি। ধর কাল যাচাই করে সত্যটাই পেয়ে গেলি। জানলি তোর মা খারাপ। দুঃশ্চরিত্রা, তাহলে তাকে ছুঁড়ে ফেলে চলে যাবি! তখন সব সম্পর্ক মেকি হয়ে যাবে, তাই না?

–তা তো জানি না। আমার মাকে আমি বড় সুন্দর করে পেয়েছি। এর থেকে বড়ো সত্য আর কী হতে পারে! তুহিন সরমাকে আদর করতে গেলে সরমা ছিটকে সরে যায়।

–মিথ্যে। সব মিথ্যে। মানুষের মন বড় শক্ত জিনিস। বাইরে থেকে বোঝা কষ্ট।

তুহিনের অস্বাভাবিক লাগল মাকে। কেমন আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছে। সে মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে বলে– মাগো, আমাকে যেমনভাবে যা কিছুই ভাবো, কোন দুঃখ নেই। কিন্তু ওরা যে তোমাকে গভীর ষড়যন্ত্র করে ঠকিয়েছে মা। ওরা তোমাকে কলঙ্ক দিয়েছে।

সরমা কিছুক্ষণ চুপ থেকে ভাবল, তুহিনকে ফিরিয়ে দেবার একটাই পথ– প্রকৃত সত্যকে প্রকাশ করে সব স্বীকার করা, তা না হলে ওকে ফেরানো শক্ত। নিজেকে শক্ত করে সরমা বলল– ওরা মিথ্যে কিছু বলেনি। একজন স্বৈরিণীকে স্বৈরিণী-ই বলেছে, এতে দোষ কোথায়?

–মা! এ কী বলছ তুমি?

–কী হল বাবা। ঘৃণা হচ্ছে। যত খুশি ঘৃণা করো, আসল সত্যটা হল সুরেশ কাকুর সঙ্গে অসতর্ক মুহূর্তে আমার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সুষমা...।

–না!

কাতরে ওঠে তুহিন– অমন করে বলো না মা, বলো না। শুধু একবার বলো এসব মিথ্যা। তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ। কিংবা এখান থেকে তাড়ানোর জন্য এসব বলছ।

–হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। দিবাকরের কাছ থেকে তোকে ছিনিয়ে নিয়ে তার উপর প্রতিশোধ নিতেই প্রথমে মিথ্যে বলেছিলাম। ভেবেছিলাম তাঁর কাছ থেকে তোকে কেড়ে নিয়ে বোঝাবো সন্তান হারানো শোক কত মর্মান্তিক। কতখানি কষ্ট দেয়। কিন্তু ভেবে দেখলাম, যার সঙ্গে কুড়ি বছর কোন সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে প্রতিশোধের খেলাটাও পাপ। তাছাড়া দিবাকর তো কোন অন্যায় করেনি। যে কোন পুরুষ হলে তাই করত।

তুহিনের বুক শূন্য হয়ে গেল। এতদিনের স্বপ্নকে সে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে দেখল। মায়ের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারল না সে।

আহত, বিপর্যস্ত সরমাকে ছুটে ঘরে যেতে দেখেও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। মাকে ডাকার শক্তিটুকুও তার হারিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমুঠো জোনাকির বৃত্তাকারে ঘুরে সবুজ পাতায় পাতায় ছেয়ে যেতে দেখল। উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তুহিন।

সরমা ছুটতে ছুটতে পায়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটে খোঁয়াড়ের কাছে গিয়ে হাঁস-মুরগীগুলো ছেড়ে দিল। রান্নাঘরে ঢুকে থালা, বাসন, ভাত ভর্তি হাঁড়ি ছুঁড়ে দিল উঠোনে। সাদা ভাত ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সুষমা কাছে-পিঠে কোথাও ছিল। মায়ের অগ্নিমূর্তি দেখে মাকে সামলাতে গেলে সরমা তাকেও ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। দাওয়ার খুঁটিতে মাথাটা টুকে গেল তার। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকল সে।

তুহিন পা দুটো তুলতে পারল না। যেন অজস্র শিকড় নেমেছে তার পায়ে। সে দাঁড়িয়ে দেখল, জয়ন্ত সুষমাকে টেনে তুলছে। কপালে জল দিতে দিতে মায়ের উদ্দেশ্যে বলছে– মা কী হচ্ছে এসব। চুপ করে বস।

তুহিনকে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জয়ন্ত এসে কাঁধে হাত রেখে বলল– মায়ের কথায় রাগ করো না দাদা। মায়ের এমন মাঝে মাঝে এমন হয়। এখন দিন পনের এমন পাগলাপনা চলবে। ঘরের জিনিসপত্র ভাঙবে, এখানে ওখানে চলে যাবে। খুঁজে নিয়ে আসতে হয় বলে এখন বেঁধে রাখি কিংবা ঘরে বন্দী করে রাখি। দিন পনের পর আবার স্বাভাবিক। তখন এসব কিছু মনে থাকে না ওর।

চোখে হাত চাপা দিয়ে সুষমা কাঁদছে। জয়ন্ত তাকে সান্ত্বনা দিল– চুপ কর্ মাকে কোনভাবে ঘরে ঢোকানোর চেষ্টা কর। ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল দিয়ে দে।

সারমার চিৎকার, গালাগাল, এটা-ওটা ভাঙার শব্দ বাইরে থেকে শুনল তুহিন। নিজেকে খুবই অপরাধী মনে হল তার। জীবন নামক এক অস্থির সমুদ্রের বহুমুখী স্বভাব টের পেল। এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইল সে।

জয়ন্ত এসে তুহিনের পাশে দাঁড়ালে সে কান্নার মত কাতর স্বরে বলল– খারাপ হোক, নষ্টা হোক উনি তো আমাদের মা। ফেলে তো দিতে পারি না।

তুহিনের সারা শরীর শিরশির করে। তার বড্ড শীত করছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে অদ্ভুত ঘুম নামছে। সে হাত বাড়িয়ে জয়ন্ত সুষমাকে কাছে টানতে গিয়ে বুঝল তার হাত কাঁপছে।

বনশ্রীনগরের কাকপক্ষী জেগে ওঠার আগে তুহিন জেগে উঠল। রাত কত ঠাহর করতে পারল না। সন্তর্পণে মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়াল। বাইরে থেকে শিকর দেওয়া। কান খাড়া করে ভিতরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল, কিছুই পেল না। আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুল। এক তাড়া খাওয়া মানুষের মত ছুটতে ছুটতে চলে এলো বাসস্ট্যান্ডে। বাকি রাতটুকু ওখানেই কাটাল। ভোরের বাস ধরে কলকাতায় যাবে সে। চায়ের দোকানের বেঞ্চিটায় বসল।

মায়ের পাগলামি দেখে মনে পড়েছিল রাস্তার পাগলাদের কথা। ওদের জন্য দুঃখ হল তার। ওদের অতীত-

ভবিতব্য বর্তমান বলতে কিছুই নেই। পৃথিবীর রূপে-রসে-গন্ধে এদের কোন বৈচিত্র্যের অনুভব নেই। মানসিক কত আঘাত পেলে মানুষ পাগল হয়।

প্রথম বাস এল রাত সাড়ে তিনটেয়। বাসে বসে তুহিন মনে মনে প্রশ্ন করল কোথায় যাবো? আমার তো ঘর নেই। ঠিকানা থেকেও ঠিকানাবিহীন। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় শব্দ 'মা'। সেই শব্দের প্রতি তার অসীম ঘৃণা। তিল তিল করে গড়ে ওঠা বিশ্বাস ভেঙে ধুলো হয়ে গেছে। পৃথিবীর আর কোন নারীকে ওই শব্দে ডাকতে পারবে না সে। তার ভেতরের কান্নাগুলো কুয়াশার মতো জমে ওঠে চোখের পাতায়। যন্ত্রণায় নীল হয়ে ওঠে।

ধর্মতলায় নেমে মনুমেন্টের তলায় গিয়ে হাঁটুতে মুখ ঢেকে বসে থাকে। কোথায় যাবে– কোথাও প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, বিশ্বাস নেই। ঘরে ফিরতে মন সায় দিল না। ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেল। বিকেলে ঘুম ভাঙল তার। মনটা হাল্কা হলেও বিষাদ গেল না। একটা মন খারাপ তাকে ছুঁয়ে থাকল। সে সোজা মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল আউট্রাম ঘাট। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসল সে। দূর গঙ্গার ভাসমান জাহাজ, গাধাবোট, নৌকা, মাঝি-মল্লার হাঁক। আলো-আঁধারে জোড়া জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা নৌকা থেকে নামছে, উঠছে। ওরা ঘন্টা পিছু নৌকা ভাড়া নেয়। নিভৃতে প্রেম করে। সবই যেন নিয়মের খেলা। নিয়ম করে চলছে বলেই কোন সংঘাত নেই। সংঘর্ষ নেই। অনিয়ম হলেই সংঘাত বাড়বে।

পশ্চিমে বিদ্যাসাগর সেতুর উপর দিয়ে রক্তবর্ণ সূর্য আস্তে আস্তে গড়িয়ে নামছে। অস্তমিত সূর্যের দিকে চোখ রেখেই খুবই বিপন্নবোধ হল তার। আত্মহত্যার ইচ্ছা হল। নামতে থাকল জলের দিকে। জলের শীতল স্পর্শ পেল। অন্ধকার ঘিরে ধরেছে তাকে। ধীরে ধীরে জল ছুঁয়ে গেল পায়ের পাতা। ডুবে যাচ্ছে হাঁটু। নাকি সে নেমে যাচ্ছে জলে। মৃত্যুর আলো চমকালো তার চোখে। মেষবারের মত পৃথিবীর সবকিছুকে প্রণাম করতে ইচ্ছে হল তার। চোখ তুলে চাইল সে। আকাশে একফালি চাঁদ, গঙ্গার পাড়ে গাছের শাখা-প্রশাখায় কয়েক ঝাঁক পাখির চিৎকার। সব সুন্দর। ভিতরে ঢেউ আলোড়িত করল তাকে। কি হবে মরে গিয়ে? মরে গেলে পৃথিবীর কী-ই যায় আসে! সেই সূর্য উঠবে, চাঁদ, নক্ষত্রপুঞ্জ, পৃথিবীর মানুষ সবকিছুই থাকবে নিজের মত করে। শুধু সে থাকবে না। সব সুন্দরের ভিতরে সে অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে।

জল তার কোমর ছুঁতে আচমকা মনে পড়ল শ্যামার কথা। শ্যামা-শ্যামা, শ্যামাকে দেখার জন্য লোভ জাগল তার। শ্যামার বুকে তার অসুখী জীবনের আলো দেখতে পেল সে।

সে জানে, তার যা কিছু রাগ বিদ্বেষ শ্যামা কাছে এলেই জল হয়ে যায়। শ্যামাকে দেখলেই সে চিকন পাখী হয়ে ওড়ে। উড়ে উড়ে পার হয় আকাশ প্রান্তর। নির্ভরতার স্থল, শ্যামাই। যখন-ই মন খারাপ নিয়ে শ্যামার ভিতরে যায় তখনই শ্যামা তার নিজস্ব সংলাপে আবৃত করে। জীবন স্রোতে ফেরায়। মেয়েটির ভিতরে যে কিছু আছে তা সে বুঝতে পারে।

জল যখন তার বুকের পাঁজর ছুঁয়ে মৃত্যুর হিম অনুভব দিল তখন ঘোর লাগা চোখ তুলে সে দেখল জ্যোৎস্নালোকে পবিত্র সুন্দর যেন জলবিহারে মেতেছে। রূপোগলা জলে অজস্র উম্মাদ ঢেউ-এর সুখানুভূতি। সে ভিতরে ভিতরে কিছুর টান অনুভব করল।

কাছে পিঠে একজন মাঝির চিৎকার– হেঁই বাবু উঠে যান। বান আসছে।

চমকে উঠল তুহিন। এ কোথায় চলেছে সে। হঠাৎই তার নিজের প্রতি মায়া হল, মরতে ভয় পেল। শ্যামার ভাসাভাসা চোখ দুটি বর্ণময় হয়ে উঠল। দ্রুত পাড়ে উঠতে থাকে। পাড়ে উঠে হাঁপায়। ততক্ষণে বানের পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নদীর বুক। তার ডুবে মরতে যাওয়ার জায়গাটা আর খুঁজে পেল না।

জামা-কাপড় ভিজে জবজবে। এক পায়ে চটি। অন্য পায়ের চটি বানের তোড়ে ভেসে গেছে। তুহিন এ চটিটাও জলে ছুঁড়ে দিয়ে দায়মুক্ত হল। হাঁটতে শুরু করল সে।

পথের মাঝে থমকে দাঁড়ায়। কোথায় যাবে সে। পৃথিবীর অজস্র পথ গেছে এঁকে বেঁকে। সে একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটা পথ অন্য এক পথে। স্ট্যাণ্ড রোড ধরে হাওড়া ব্রিজের মাঝ বরাবর পৌঁছে মনে হল, সে তো পৌঁছতে চেয়েছিল শ্যামবাজার, তবে এখানে এল কেন? প্রশ্নের কোন ব্যাখ্যা পেল না সে।

রোলিং ভর করে গঙ্গার জল দেখল তুহিন। জোয়ারের স্বাদে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে জল! জলের তোড়ে তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে জলে ভাসমান আবর্জনা, নৌকা আরও কত কী! জলের গন্ধ প্রাণভরে নিল সে। কিছুক্ষণ আগে এই জলে ডুবে মরতে চেয়েছিল। সেই জলের ঘ্রাণে ছড়িয়ে পড়ছে প্রাণের আনন্দ।

শ্যামার কাছে যাবার ইচ্ছা আপনা থেকেই মরে এল তার। শ্যামাকে মনে হল চিকন পাখি। শুধু লোভাতুর করে, কখনও ধরা যায় না। রূপের বিভায় পোড়ায়। প্রতিদ্বন্দ্বী তারই বন্ধু দেবু। ত্রিকোণ প্রেমের সাম্য বজায় রেখে চলেছে শ্যামা। সে কার কাছে ধরা দেবে, তা একমাত্র জানে শ্যামাই।

আর দেবুর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে ইচ্ছে করল না তার। দেবুর কাছ থেকে শ্যামাকে ছিনিয়ে নেবার কথা ভাবতে গিয়েই ভাবল– জোর করে কাউকে ভালোবসা যায়? না ভালোবাসা হয়?

সে হাঁটা দিল হাওড়া স্টেশনের দিকে। স্টেশনে পৌঁছে ঘড়ি দেখল। স্টেশন চত্বর ভিড় না হলেও ফাঁকা। দূরের যাত্রীরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। শুয়ে বসে গল্প করছে। তুহিন প্রায়ই দেখেছে এ দৃশ্য। দেখে বার বার মনে হয়েছে– মানুষের যেন কোন দূরতম দেশে যাবার প্রতীক্ষা। ট্রেন আসে, কোলাহলে ভরে যায়। ট্রেন চলে গেলে আবার শূন্য, কোলাহলহীন। আসা-যাওয়া শাশ্বত সত্যের ভেতর ঢুকে পড়ে সে– জীবন ভাঙা গড়ার মতো। সে যেন জীবনের এক ভাঙা টুকরো। ছিন্ন-ভিন্ন বস্তু।

ক্লান্তিতে পা দুটো ভারী হয়ে আসছে তার। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে সাত নম্বর প্লাটফর্মের সামনের ফাঁকা জায়গাটা খুব নিরাপদ মনে হল তার কাছে। সারাদিনের ক্লান্তি, ধকল, যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশ্চর্যতম সুন্দর জায়গা খুঁজে পেয়েছে সে। ভাবা মাত্রই ছুটে গিয়ে জায়গাটা দখল করল। ভিজে জামা প্যান্ট গায়ে খুবই অস্বস্তিতে রেখেছে। ভিজে প্যান্ট ছেড়ে জাঙ্গিয়ার উপরে জামাটা কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে নিল। একটা ট্রেন এসে ঢুকল স্টেশনে। কোলাহলপূর্ণ হল স্টেশন চত্বর। কিছুক্ষণ পর আবার শুনসান।

তুহিনের মাথার ভেতরে অজস্র জট পাকানো অন্ধকার। সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। জীবনে প্রথম ঘরের বাইরে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পা রেখে এক অস্তিরতায় কাঁপতে থাকে ভেতরে। ক্লান্তি আসে। সারা দেহমন জুড়ে এক ধরনের অবসাদ। তার থেকে কয়েক হাত দূরে সারি সারি ঘুমন্ত মানুষজনদের দেখে তার অসহায়তা আরও বেড়েছে। চোখ বন্ধ করতে নিজের থেকেই প্রশ্নগুলো ঝেঁকে আসে, ওরা কি সবাই দূর কোন পথের পথিক; ওদের কি কোন নিজস্ব ঠিকানা নেই; নাকি ঠিকানা থেকেও ঠিকানাবিহীন। আমার মতো স্নেহ মমতাহীন অসহায়। যাত্রী ও ভবঘুরের বৈচিত্র্যময় রূপটি কল্পনা করে ওদের মতই নিজেকে মনে হল তার।

খিদে পাচ্ছে। নাড়ি-ভুঁড়ি পাক দিয়ে শরীরের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ছে খিদে। গতকাল রাতে মায়ের হাতের ভাত বড় তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিল। মাঝখানে একটা গোটা দিন ও রাত গত প্রায়। পকেটে একটাও পয়সা নেই ভেবে খিদেটাকে হজম করার চেষ্টা করে পেট চেপে পড়ে থাকল।

রাত কাটানোর নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে সারাদিনের ধকল ও চিত্তচাঞ্চল্য ঘনীভূত হল স্বপ্নে। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, অবারিত মাঠের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে সে, হাঁটতে হাঁটতে খসে পড়ছে তার পায়ের পাতা, গলে যাচ্ছে শরীরের মাংস মেদ। তার হাড় জিরজিরে শরীরের দিকে উড়ে যাচ্ছে কয়েক ঝাঁক শকুন। ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোও যেন তার মৃত্যুর অপেক্ষায়। সে অসহায় চোখে দেখছে। তাড়ানোর শক্তিটুকু হারিয়েছে যেন। দম বন্ধ করে সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করতে গিয়ে তন্দ্রা ছুটে গেল তার।

মন খারাপের আলো জড়িয়ে ধরল তাকে। অদ্ভুত সবুজ আলোর ভেতরে বাণীমা'র মুখ দেখল তুহিন। সবুজাভ আলো যেন স্নেহময় হাত বাড়িয়ে ডাকল, এসো।

তুহিন দু'হাত দিয়ে সবুজ আলোর রশ্মি আড়াল করতে চোখ ঢেকে বলল– না মা, তোমার কাছে যাবার মতো আমার মুখ নেই।

–কেন?

–বড়ো পাপ করেছি, তোমাকে অসম্মানের কঠিন শাস্তি, মৃত্যু।

–একী বলছ বাবা! মায়ের কাছে সন্তানের কোন দোষ ধরা পড়ে না।

–আমার এ অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আমার শাস্তি চাই।

–নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ এটাই তোমার শাস্তি।

–এক পাপিনীর জন্য তোমার মত দেবীকে অপমান, এ সহ্য করা যায় না।

–না, জন্মদাত্রীর সম্পর্কে অমন বলতে নেই। তিনি যাই হোক, পরিস্থিতি, সময়, কিংবা অন্যকোন কারণে বিপথগামী হয়েছে, তা বলে তাকে ঘৃণা করো না। হাজার হোক সে তোমার মা, তার ঋণ তুমি কখনও শোধ করতে পারবে না, কোন মূল্যেই পারবে না।

অবাক হয়ে সবুজাভ আলোর মূর্তির দিকে গভীর চোখে দেখল সে। আলোর মূর্তি তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে নিচ্ছে। তুহিন তার তাপ সহ্য করতে পারল না। সে আলোর স্বরে বলে উঠল– আমাকে ছুঁয়ো না, তোমার মত দেবীর স্পর্শ আমি সহ্য করতে পারব না।

আলো হেসে বিচ্ছুরিত হল; অজস্র প্রতিধ্বনিতে বলল– পাগল ছেলে; আমার কাছে না আসো, তোমার মা সরমার কাছে ফিরে যেও।

–উঃ, সরমা, সরমা, সরমা। ঘুমের ঘোরে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে ওঠে তুহিন। দু'হাতে প্রবল জোরে আলোকণা সরিয়ে উঠে বসতে গিয়ে দেখে তার সামনে এক মাঝ বয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুহূর্তে আলোকণা ভরা মুখটায় মমত্ব মাখা কৌতূহল তাকে বিস্ময়ে বেঁধে এক গভীর আবেগে স্নিগ্ধ করে। গৌরবর্ণা রমণীটির মুখাবয়বে এখনও যৌবনের লাবণ্যকণা সামান্য হলেও রয়েছে। উসোক-খুসকো চুলের গুচ্ছ তার সারা পিঠময় ছড়িয়ে, পরনের আধময়লা ছাপা শাড়ি তার ভেতরের সৌন্দর্য্যকে বিবর্ণ, ধুলোমলিন করে রেখেছে। তার চোখের গভীর থেকে আলোর বিচ্ছুরণ দেখে বিস্মিত হয়ে তুহিন চেয়ে রইল সেই দিকে।

তুহিনকে চঞ্চল হয়ে উঠে বসতে দেখে রমণীর আলোমাখা কণ্ঠে প্রশ্ন– কে বাবা তুমি? তখন থেকে দেকছি ছটফট করছ? শরীর খারাপ?

তুহিন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে মাথা নাড়ল, না।

মহিলার সঙ্গের পুরুষটি তুহিনের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে দেখে বলল– এ জায়গাটা আমাদের, তুমি অন্য কোথাও যাও। মহিলার সঙ্গের পুরুষটিকে এতোক্ষণ দেখেনি তুহিন। ওর কথা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দু-ক্র্যাচে ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝ বয়েসী একজন পুরুষ।

পুরুষটিকে দেখে মায়া হল তার। ওর কথার উত্তর দেবার আগেই মহিলার ঝাঁঝাল গলা– কেন, জায়গাটা তোর কেনা নাকি? তুই ওকে সরে যেতে বলছিস। দেখছিস না ওর শরীর খারাপ। ওইতো পাশে অনেক জায়গা আছে শুয়ে পড়।

লোকটির অবস্থা দেখে তুহিন নিজেই সরে গিয়ে ওর বসার জাযগা করে দিল। লোকটি হাতের ক্র্যাচ দুটো রেখে ছেঁড়া চট পেতে তার উপর শুয়ে পড়ল।

মহিলাটিও বসল তার পাশে। তুহিনকে ওখানে বসে থাকতে দেখে বলল– শুয়ে পড় বাছা, ভোরের ট্রেন ধরতে হবে।

–আপনারা কোথায় যাবেন?

–কোথাও না। ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষা করি। যখন যেখানে রাত হয় সেখানেই থাকি। রাতটুকু কাটিয়ে আবার ট্রেন। ট্রেনেই আমাদের জীবন।

–ওনার এমন অবস্থা হল কী করে?

–কি জানি? বলে তো ট্রেনে কাটা পড়েছে।

–কেন আপনি জানেন না?

–কী করে জানব! এই ত মাস তিনেকের আলাপ। ট্রেনে ভিক্ষা করতে করতে চেনা-জনা হয়ে গেল। ওরও এ সংসারে কেউ নেই, আমারও। দু'জনেই মিলেমিশে থাকতে থাকতে যেন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

–কেন আপনার ঘর-সংসার, স্বামী কিছু নেই?

–ছিল। আজ কেউ নেই। স্বামী ট্রেনে ফেরি করত। একদিন ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তোমার মত একটা ছেলে ছিল, সেও ট্রেনে করে কোথায় যে গেল, তার হদিস এই ক'বছরেও পেলাম না। বুক বেঁকে আছি, যদি ট্রেনে কখনও কোথাও দেখা হয় যায়।

তুহিনের ভিতরটায় এক ধরনের অনুকম্পন হল। ভদ্রমহিলার কথার রেশগুলো ধরে বুকের শীতলায় ধৌত করে আকুল হল। জীবনের বিচিত্র রংগুলো তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। রমণীটির ঘুম ঘুম চোখের পাতা চুঁয়ে ভাবনা এল, এদের কোন সম্পর্ক নেই; অথচ কেমন সুন্দর সম্পর্কের স্থিতিতে আবদ্ধ। অলিখিত বন্ধনে বাঁধা রয়েছে। একেকজন একেকজনের উপর নির্ভরশীল। ওদের দেখে অসঙ্গতিপূর্ণ জীবনের অর্থ খুঁজে পেল সে।

তুহিনের ঘুম এল না। ভিজে জামার নীচে ভিজে জাঙ্গিয়া। বড় শীত করছিল তার। সামনের রেলিং-এ চোখ পড়তেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল তার। সামান্য প্যান্টটি কে বা কারা কোন ফাঁকে হাতড়ে সরে পড়েছে। প্যান্টের জন্য শোক হল তার।

উদাস চোখে রেলিং-এর শূন্যতাকে ছুঁয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ঘুম নেই। চোখ বন্ধ করে সারাদিনের ভাবনাগুলো ভাবতে থাকল। সবে যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হচ্ছে সেই সময় পাশের মহিলাটির কাছ থেকে শব্দ ভেসে এল–ঘর কোথায়?

–ঘর নেই।

–এখানে তো কোনদিন দেখিনি।

-আজই এলাম।

– কোথায় যাবে?

–জানি না। এত বড় পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও স্থান হয়ে যাবে।

–ঝগড়া করে এসেছ বুঝি?

তুহিন উত্তর দিল না। চুপচাপ বসেই থাকল।

তুহিনকে উত্তর না দিতে দেখে মহিলাটি পাশ ফিরে শুতে গিয়ে তুহিনকে বসে থাকতে দে খে উঠে বসল আবার। মহিলটির উঠে বসার শব্দে ল্যাংড়া মানুষটির ভাঙা কণ্ঠ–মেলাই ফ্যাচফ্যাচ করিস কেন, চুপ করে শুয়ে পড়। মহিলটি তার কথায় উত্তর না দিয়ে তুহিনকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল–

–বাপ মা নেই?

– থেকেও নেই।

–বুঝেছি, ঝগড়া করে বাড়ি থেকে পালিয়েছ। তাই ঘর থেকেও নেই।

তুহিন বিড়বিড় করে। পৃথিবীর সর্বত্র আমার ঘর। পথই আমার বাপ মা। তুহিনকে জড় হয়ে বসে থাকতে দেখে মহিলাটি বলে তুমি জাঙ্গিয়া পরে বসে কেন? কাপড় জামা নেই। দেখতে মনে হচ্ছে ভিজে ভিজে, শীত শীত করছে।

–হুঁ শীত করছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে।

মহিলাটি ব্যস্ত হয়ে ওঠে– সে কী দেখি দেখি। বলে উঠেই তুহিনের কাপালে হাত দেয়– ইস্ গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। দাঁড়াও। বলে পুঁটলি থেকে একটি আধময়লা শাড়ি বের করে তুহিনের দিকে ছুঁড়ে দিল। এটা গায়ে

চাপা দাও, পরনের জামা দেখে বলল–এটাও দেখছি ভিজে । খুলে ফেল। এই গামছা পরে শুয়ে থাক।

তুহিনের কোন কিছুই বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না। প্রবল জ্বরের ঘোরে সমান্য তাকিয়ে দেখল। হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মের আলোগুলোর মধ্যে এক অদ্ভুত আলোর মূর্তি তার দিকে বিহ্লভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তার উত্তপ্ত শরীরে স্নেহময়ী আলোর সঞ্চরণশীল অনুভব তাঁকে এক সামাচ্ছন্ন জগতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন ঘোরে সময়ের বৃন্তচ্যুত পাপড়ি কুড়িয়ে তার সুগন্ধ নিয়ে এক গভীর জীবনের গন্ধ পেল সে; আর দেখল এক বিহ্ল আলোরমণী সারা রাত জেগে বসে রয়েছে তার শিয়রে।

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে হুঁশ হল তুহিনের। মাথা প্রচণ্ড রকমের ভারি। চোখ যেন বুজে আসছে, খুলতে পারছেন। ট্রেনের ঝমঝম শব্দ, মানুষের কোলাহল, হকারদের চিৎকার শুনে তার অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করে ঘোরলাগা চোখ মেলে দেখল, সে আছে একটি ট্রেনের কামরায়, বেশি ভিড় নেই। বেশ ফাঁকা। এরই মাঝে তার কানে ভেসে এল কেউ যেন ভাঙা গালায় গান ধরেছে, 'অমলকান্তি একদিন রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।'

তুহিন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সেই ন্যাংড়া পুরুষটি ট্রেনের কামরায় গান ধরেছে। আর সঙ্গের মহিলাটি যাত্রীদের কি হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে–বাবুগো দু-একটা টাকা দেবেন; ছেলেটার ভীষর জ্বর, ডাক্তার দেখাব, বাবুগো একটা টাকা দেবেন বাবুগো।

তুহিনের বুকের ভিতর থেকে অস্বস্তির বৃন্তগুলো বেরিয় পরিতাপের বিষয় হয়ে উঠল, তার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত অসহায় দু-জন তাকে নিয়ে বেঁচে থাকার রসদ পেয়েছে। বাধা দেবার প্রবৃত্তি হল না তার। চোখ তুলে সামান্য দেখার চেষ্টা করে আবার শুয়ে পড়ল।

ট্রেন তখন ছুটে চলেছে দুর্বার গতিতে। কত স্টেশন ছাড়িয়ে, গ্রাম, ধানের ক্ষেত, ডাঙা, মাঠ, জঙ্গল আর শহরের পাশ দিয়ে দূরতম কোন স্টেশনের দিকে। তুহিন চুপ করে থাকে; জীবনের এই অসম্পূর্ণতার ভিতরে একটু খানি আশ্রয়ের নিরবচ্ছিন্ন সন্ধিমুখে।

দেওয়ালের দিকে মুখ রেখে শুয়ে আছে দিবাকর। বাণীর যত্ন করে সাজান ঘরখানায় শুয়ে থাকলে মনে হয় কোন নার্সিংহোমের কেবিন ঘর। বিছানায় সাদা ধবধবে চাঁদর। মাথার কাছে টেবিলের উপর জলের গ্লাস, ওষুধের শিশি। ফল, পাশে আলনায় তোয়ালে চাদর। হাতের কাছে বেডসুইচ। খাটের নীচে বেডপ্যান। বাণীর যত্ন দিবাকরকে অসুস্থতা বুজতে দেয়নি।

দিবাকর তার এই ছোট্ট পৃথিবীতে একা। পৃথিবীর আলো-বাতাস, ঘর-সংসার, মায়া-মমতা, কোন কিছুই স্পর্শ করছে না তাকে। আঘাতে-আঘাতে, শীর্ণ-জীর্ণ শরীরটায় প্রাণের স্পন্দন ছাড়া কিছুই নেই। দিবাকর তার চার দেওয়ালের পৃথিবীতে বিচ্ছিন্ন, একা।

প্রতিদিনের মতই সূর্য উঠছে, ডুবে যাচ্ছে। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার সুখে দ্বন্দ্বে পূর্ন হচ্ছে পৃথিবী। মানুষ চলমানতার অভিক্ষেপণে ঝাঁপ দিচ্ছে কর্ম যজ্ঞে। সারাদিনের কর্ম-ব্যস্ততায় ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরছে। ঘরের বর্ণময় সৌন্দর্যে শান্তির বলয়ে পরিবার-পরিজনে, সুখের বাতাবরণ সৃষ্টি করে, সুখে-দুঃখে নিজস্ব বিভাবে রচনা করছে আপনার পৃথিবী।

দিবাকরের সাজানো সংসার জীর্ণ, বিবর্ণ। তার জীবনে নির্মল প্রভাত আসে যায়, নির্বিকার থাকে সে। দীর্ঘ পাঁচটি বছর আশায় বুক ভেঁধে আছে। একটা আশার বলয় তৈরি করে বেঁচে আছে। তুহিন একদিন ফিরে এসে তার বিবর্ণ পৃথিবীকে আলোয় ভরিয়ে দেবে। দিন যায়, তারই ভাবনায়, জারণে দিন যায় তার, সে আসে না।

দু-দু'বার ষ্ট্রোক হয়ে গেছে। বাইপাস সার্জারী হয়েছে একবার। তার উপর এক বছর হ'ল পক্ষাঘাতের পঙ্গু। উঠতে পারে না, চলতে পারে না। ভারি হাত মুখে উঠে হাত মুখে উঠে না। কেউ খাইয়ে না দিলে খেতেও পারে না। বাণী আছে বলেই তার বেঁচে থাকা টের পায় সে। হুহু শূন্যতার ভিতরে জীবনের স্পন্দন।

বাণী তার জীবনে দিয়ে আগলে রেখেছে দিবাকরকে। স্বামীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার আশার কথা শোনাতে পারেন নি। পৃথিবীতে যে কটাদিন থাকবেন, এভাবেই দিন কাটবে। দিবাকরকে দেখে ভাবে–তাকে আর বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। মৃত্যু গন্ধ দিবাকরের শরীরে, চোখে-মুখে। তা অনুভব করে,

কষ্ট পায় সে। বাণী জানে জীবনে যাকে নিয়ে মুখুর হতে চেয়েছিল, তাকে আর ধরে রাখা যাবে না। ধরে রাখতে পারার মতো কোন ক্ষমতাই নেই। সুখের মধ্যে নীরাকে ভালো পাত্রস্থ করতে পেরেছে। ছেলেটি ডাক্তার। ওরা দার্জিলিংয়ে থাকে।

নীরার বিয়ে, দিবাকরের চিকিৎসা, সংসার, স্কুল,ব্যবসা সামলাতে সামলাতে বাণী হাঁপিয়ে উঠেছে। জলের মতন খরচ হচ্ছে। বই-এর ব্যবসা বন্ধের মুখে। কে দেখবে ওসব। একা বাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া তার নিজের কোন তাগিদও নেই। যাদের জন্য জীবন; তাদেরই যখন কাছে পেল না, কি হবে এসব নিয়ে তুহিন যেন কর্পূরের মতন উবে গেল। বাণী কাউকে কিছু না জানিয়ে বনশ্রীনগরে লোক পাঠিয়েছিল। সঙ্গে তুহিনকে চিঠি। পত্র-বাহক ফিরে এসে জানাল, তুহিন বনশ্রীনগরে নেই। এক সপ্তাহ থেকে ফিরে এসেছে।

খবরটা দিবাকরকে আঘাত করেছিল সবচেয়ে বেশি। তুহিনের হারিয়ে যাওয়া সহ্য করতে পারল না। শয্যাশয়ী হল, পক্ষাঘাতে পঙ্গু। বাণী নির্বাক হয়ে থেকে গেল পাঁচটি বছর। হৃদয়ের শূন্যতা ক্রমশঃ বিশাল হতে হতে এতটা বিস্তৃত হল যে– কেউ কোন তল পেল না। একটা সময়ের অপেক্ষায় বেচে থাকল দু'জনে।

বাণী জানে, দিবাকরের কিছু হলে অনেক বাগীদার ছুটে আসবে সম্পত্তির লোভে। তাই আগে থেকেই সতর্ক। দিবকরের এক কানাও করচ করে না সে। নিজের প্রভিডেন্ট, গ্রাচুয়িটি জমান যা ছিল সবই শেষ করে দিয়েছে। তার আগে পিছে কোন টান নেই বলেই অত ভাববার দরকার নেই। দু-একটা টিউশান করলেই নিজের পেট চলে যাবে। শুধু এ সম্পত্তি যার তার জন্য গুছিয়ে রাখে, সে যেন কোনদিন এসে বলতে না পারে, তুমি আবার সব আত্মসাৎ করেছ!

ছেলেটা এভাবে চলে যাবে ভাবতে পারেনি কেউ। সবাই এর মতো বাণীও ভেবেছিল– ভুল বুঝে, রাগ করে গেছ; রাগ পড়লে আবার ফিরে আসবে।

মাস গেল, বছর গেল। বছরের পর বছর, ছেলের হদিস পেল না কেই। বাণী কঠিন সময়ের পদধ্বনি বুকে চেপে বসে থাকে।

একদিন মাঝরাতে দিবাকরের গোঙানির শব্দে জেগে উঠে বাণী দেখল – সারা বিছানা জুড়ে দিবাকর কাকে হাতড়ে খুঁজছে।

ক্রমশঃ পিছু হটতে হটতে বিছানার বাইরে চলে এসেছে।

বহু কষ্টে স্বামীকে বিছানায় টেনে তুলে তার চোখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল, দিবাকরের মুখে এক অদ্ভুত আলো। আলোর প্রতিসন্নে ঘোর ঘোর ভাব। গলায় কফের ঘড়ঘড় শব্দ। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসছে সে। দু-ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বাতাস বেরুচ্ছে। মাঝে মাঝে নিস্তব্ধ। চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল। মাথার বালিশ ভিজে যাচ্ছে জলে।

বাণী দিবাকরের মুখের কাছে ঝুকে জিজ্ঞেস করলো–জল খাবে? দিবাকর কথা বলে না। গোঙায়।

বাণী তার মুখে কয়েক চামচ জল দিতেই, গালে ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে নামে। ঢোঁক গেলার চেষ্টা করে ।

বাণী বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে–কষ্ট হচ্ছে?

দিবাকর সারা ঘরময় চোখ ঘুরিয়ে দেখে। কাকে খুঁজছে বুঝতে পারে বাণী । সে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নীরবে কাঁদে– কাকে খুঁজছে, তুহিনকে?

দিবাকর হাতটা তোলার চেষ্ট করে, ফ্যালফ্যাল করে বাণীকে দেখে।

বাণী বিহ্লভাবে বলে–এই বিশাল পৃথিবীতে কোথায় পাবে তাকে?

নিশ্চুপ দিবাকর।

বাণী কাতর কণ্ঠে উত্তাল হয়ে বলে অমি পাপী,আমার জন্য তোমার সংসার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আমাকে পারলে ক্ষমা করো। বিশ্বাস করো, তুহিনকে আঘাত দিয়ে তাড়াতে চাইনি। তার ভবিষ্যতের কথা

ভেবে ভালো করতে চেয়েছিলাম। সে আমাকে ভুল বুঝল।

দিবাকর চুপ করে থাকে। বাণীর আর্তনদ তাকে স্পর্শ করে না। চেয়ে থাকে শুধু। বাণী বুঝতে পারে মৃত্যু-আলোর ভিতর পা রেখেছে দিবাকর। পৃথিবীর আর কোন টানে তাকে ঘরে রাখা যাবে না। সে স্বামীর মুখে এক চামচ জল দিল। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জল। তার আধখোলা চেখের ভিতর থেকে অদ্ভুত এক আলোর পাখি উড়ে সারা ঘরময় ছেয়ে গেল। ক্ষুদ্র পুতিপোকার মত পৃথিবীর নীড় থেকে উড়াল দিল শূন্যে।

কঁদে উঠল বাণী । তার আর্তনাদে আশেপাশের ফ্ল্যাট থেকে মানুষজনেরা ছুটে এল। এ পরিবারের বহুদিনের সঙ্গী ডাঃ ঘোষ। দার্জিলিংএ মেয়ে-জামাইকে ফোনে দুঃসংবাদ জানাল। খবর গেল দেশের বাড়িতে।

দিবাকরের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে দেশের বাড়ি থেকে অনেক আত্মীয়-স্বজন এল। শুভঙ্কর ও তার বৌ,ছেলে এসেছে। বনশ্রীনগরে খবর দেওয়ার কথা উঠতে শুভঙ্কর বাধা দিয়ে বলল–ওখানে খবর দেওয়া ঠিক হবে না বৌধি।

– কেন?

–দাদা বেঁচে থাকতে যাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি, যাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করেনি আপনি কেন তাদের সম্পর্ক গড়তে চাইছেন?

–কেউ যদি কোন ভুল করে, তা বলে আমি তা করব কেন?

–ভুলের কথা নয়। একটা মান-সম্মানের ব্যাপার।

–যার সঙ্গে বিবাদ সে যখন নেই, কী হবে ওকথা ভেবে। তাছাড়া তুমি বোধহয় ভুলে গেছ ওখানে সরমা ছাড়াও তোমার এক বাইপো ভাইঝি রয়েছে।

–জানি, আর সেই জন্যইতো বলছি, খাল কেটে কুমীর আনবেন না। বানী চুপ করে থেকে বলল–কিন্তু তুহিন নেই; শ্রাদ্ধশান্তি করবে কে?

– কেন? আমার ছেলে আছে।

–না, শুভ। ওসব করবে ওর ছেলেই। – কে, জয়ন্ত?

–হ্যাঁ, সেটা তার অধিকার।

–কিন্তু, দাদা তাকে ছেলে বলে স্বীকার করেনি।

–সেটা ওর ভুল ছিল। তোমার বৌদি সরমা যখন বাপের বাড়ি চলে যায়, জয়ন্ত তখন খুব ছোট। তাই ছোট শিশুকে নিয়ে চলে আসতে ভরসা পায়নি বলেই; জয়ন্ত ওর মার কাছে আছে। সেজন্য সে তার অধিকার হারাবে কেন?

সামান্য ভুলে মানুষের জীবন কীভাবে ভেঙে যায়। তা টের পায়না কেউ। শ্রাদ্ধের দিন জয়ন্ত এল, জয়ন্তকে দেখে বাণীর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। আহা এমন সোনার টুকরো ছেলে, বিশ বছর ধরে বাবা কী জিনিস জানল না। স্নেহ-মমতা ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থেকে গেল।

জ্ঞান হওয়া থেকে যে বাবাকে চোখে দেখেনি, তার শোকে কান্নায় ভেঙে পড়লে বাণী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে–কেঁদো না জয়ন্ত, কেঁদো না। মানুষের জীবনে মৃত্যু তো আছেই। কষ্ট হলেও তাকে সহ্য করে নিতে হয়!

–আমি কী দুর্ভাগা, যাকে বাবা বলে ডাকার সুযোগ কোনদিন হয়নি, তাঁর মুখাগ্নি আমাকেই করতে হবে! জয়ন্ত চুপ করে থেকে কাঁদতে কাঁদতে বলে, ছোট থেকে কতবার মাকে আবদার করেছি, একবার বাবার কাছে নিয়ে চল, একদিনও নিয়ে এল না। তারপর মা পাগল হলে গেল, আর আসা হলনা!

– সরমা পাগল হয়ে গেছে?

– হ্যাঁ, মাঝে মাঝে পাগলামো করে, সেরে যায় আবার হয়। কখনও দিন পনের, কখনও মাসের পর মাস একইভাবে থাকে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। খুবই চোখে চোখে রাখতে হয়। এখন সেই অবস্থা চলছে।

– বোনটার কী যেন নাম?

–সুষমা।

–তাকে নিয়ে এলে না কেন?

–কী করে আনব? ও আসার জন্য খুবই কান্নাকাটি করেছে, কিন্তু মায়ের জন্য ওকে নিয়ে আসতে পারলাম না।

–একদিন নিয়ে এসো। আচ্ছা তুহিন বনশ্রীনগরে কতদিন ছিল?

–প্রায় এক সপ্তাহ।

–ওই কদিনে কোনরকম খারাপ আচরণ দেখেছিলে কি?

–না, তেমন খারাপ কিছু চোখে পড়েনি, তবে...।

– তবে কী হল জয়ন্ত, ওর সম্পর্কে যা জানো খুলো বল?

– যেদিন মায়ের পাগলামো বাড়ল, সেদিন মা নিজের মুখে নিজের দোষ স্বীকার করেছিল। সেদিন দাদাকে মনে হয়েছিল ও যেন ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পরছে না। ও যেন ভীষণ ক্লান্তি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল প্রায় এক ঘন্টা । প্রচণ্ড আহত হয়েছিল। কথা বলার শক্তি ছিল না।

–কোথায় গেছে তোমাদের কিছুই বলেনি, কোন আভাসও দেয়নি।

–না, ভোরের অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে চলে এসেছে। আমারা ভেবেছিলাম দাদা এখানে চলে এসেছে। তারপর মাস খানেক পরে আপনার চিঠিতে জানলাম, দাদা এখানে নেই।

বাণীর দু-চোখ জলে ভরে যায়। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে– এই বিশাল পৃথিবীতে ওকে কোথায় খুঁজি বলতো?

– কোথায় খুঁজবেন আর । আমার মন বলছে ও একদিন ফিরে আসবে। বাণী চুপ।

জয়ন্ত শান্ত হয়ে বলে– কোথা দিয়ে কী সব ঘটে যাচ্ছে কে জানে ?

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর আরও কয়েকটা দিন থেকে বলে জয়ন্ত। বাণীর অন্য রকম ভাবনা, একটা স্বপ্ন ঘিরে সে চলতে শুরু করে। জয়ন্তকে ধরে বাঁচতে চায়। আপন করে নিতে চায়। দিবাকরের আমানত তারই উত্তরাধিকারের হাতে তুলে নিশ্চিন্ত হতে তৎপর হয়ে ওঠে।

জয়ন্তের দেরী হচ্ছে দেখে বনশ্রীনগর থেকে চিঠি পাঠাল সুষমা। মায়ের শরীর খারাপ জানিয়ে পত্রপাঠ চলে আসতে লিখল। চিঠি পড়ে জয়ন্ত বাণীর কাছে চলে যাবার কথা বলল। বাণী তাকে যেতে দিল না। অনুনয় করে বলল–আর কয়েকটা দিন থেকে যাও। তুমি চলে গেলে আমি যে একেবারে একলা হয়ে যাবো। নীরা ও জামাই শ্রাদ্ধের পরদিনই চলে গেছে। এ বাড়িতে মানুষ বলতে আমি একা আমি কী করে থাকব বলত? তুমি চলে গেলে এই বিষয়-আশয়, ব্যবসার কী হবে। তুহিন নেই।তুমি যদি সব নিজের মত করে দেখ তবে দিবাকরের আত্মা শান্তি পাবে জয়ন্ত আঁতকে উঠে বলে–না, এসবে আমার দরকার নেই।

–কেন, তুমিও তো একজন উত্তরাধিকারী।

বাণীর কথা শুনের জয়ন্ত তার হাত সন্দেহে জড়িয়ে বলে–না মা, এই আমি বেশ আছি। আমাকে বেশি লোভ দেখাবেন না। ছোট বেলা থেকে একটা পাগলীকে নিয়ে কী কঠোর পরিশ্রম করে বড় হয়েছি। পেটের জন্য লেখাপড়া শিখতে পারিনি। এইটে উঠে ছেড়ে দিয়েছি। ক্ষুধা, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে আজ আমি দিনমজুর। মাথা গোঁজার মত একখানা টালির ঘর করেছি। সুষমা আর মাকে ঘিরে যেশান্তি পেয়েছি,

তাই যতেষ্ট।

–সুষমা তো বড় হচ্ছে, তার কথাটাতো ভাবতে হবে!

–হ্যাঁ, ওর একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই শান্তি বিয়ের দেখাশোনা চলছে। দেখি কী করতে পারি। আশা করি খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মায়ের চিকিৎসা করা দরকার। তার জন্য অর্থের প্রয়োজন।

–তা যদি আমি ব্যবস্থা করে দিই।

–না মা, অমন করে আমাকে লোভী করবেন না। মায়ের মুখচেয়ে বাবাকে ভুলে থেকেছি। বাবাকে কী ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করতো। মা কষ্ট পাবে জেনে কোনদিনে মুখ ফুটে বলিনি; এই বেশ আছি। আমার সমান্যতম সুখটুকু ছিনিয়ে নেবেন না। আমাকে ক্ষমা করুন।

কথাটা বাণীর বুকে কাঁটার মতন বিঁধল। সে কাতর স্বরে বলল–বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের এক কপর্দকও খরচ করিনি। তোমার বাবার ডাক্তার খরচ, ওষুধ, সংসার খরচ; সব কিছুই আমার উপার্জন থেকেই খরচ করেছি। তাছাড়া আমিই বা কার জন্য রাখবো । আমার তো কেউ নেই।

বাণীর কথায় জয়ন্ত হাসে, বলে– যেভাবে এতদিন আগলে রইলেন, শেষ কটাদিন সেইভাবেই রাখবেন। আামাকে বেঁধে রাখার চেষ্ট করলে আমি হাঁফিয়ে উঠবো ।

বাণী বুঝল, একটা হাওয়াকে সে আটকে রাখতে চাইছে। জয়ন্তকে কোন ভাবেই আটকে রাখা যাবে না।

বাণী জয়ন্তের কপালে চুম্বন করে বলল– তোমার যখন মন চাইবে, তখন–ই চলে এসো । বাণীকে প্রণাম করে জয়ন্ত চলে গেল।

জীবন নামক রণভূমিতে বাণী যেন এক পরাজিত সৈনিক। দিনপাতের হাজার ক্ষত লেগে আছে তার গায়। বিস্তার যন্ত্রণা সহ্য করে বেঁচে থাকার অদম্য নেশা তাকে পেয়ে বসে। যদিও তার সেই লড়াকু মন মরে এসেছে। যৌবনের উদ্দাম টান নেই। চোখের দৃষ্টিশক্তি অবনত; মমতামাখা মনটাও শুকনো কাঠের মত রুখু। তবুও চারপাশের নৈঃশব্দ আর একাকীত্বের দহনে কীভাবে মৃত্যুর ইচ্ছা শক্তিকে দু-হাতে সরিয়ে রাখে, তা সে জানে না। একটি মাত্র ভাবনাই তাকে জীর্ণ করে যেমন তেমনি বাঁচার প্রয়াসী করে তোলে। তুহিন নামক এক অন্ধকার তার সমগ্র সত্তা জুড়ে প্রতিদিনের মৃত্যুর ইচ্ছাকে সরিয়ে বাঁচার অগ্রাসী ক্ষুধা এক অসীম প্রতীক্ষায় রাখে; তাই সে সংসারের নির্মম খেলায় মাতে সহজ সরলভাবে। আগে পিছের ভাবনা নেই। হার জিতের ভাবনা নেই। প্রতিদিনের চলমানুতার প্রতিটি মুহূর্তকে সে আঁকড়ে থাকে।

পূর্ণ প্রকাশনী আবার চালু করছে। বাণী মাঝে মাঝে বসে সেখানে। নীরা ও জামাই কলকাতার সমস্ত কিছু বিক্রি করে তাদের সঙ্গে দার্জিলিং-এ থাকার কথা বলেছিল। বাণী আমাল দেয়নি। সে যে শ্যামবাজারের ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও যাবে না তারা বুঝতে পেরে দ্বিতীয়বার বলেনি । নীরার একটা ছেলে হয়ে মারা গেলে বাণী সেখানে গিয়ে দু-চারদিন থাকার পর হাঁপিয়ে উঠেছে। শ্যামবাজারের ছোট্ট ফ্ল্যাটের মধ্যে কী যে আকর্ষণ রয়েছে, তা সেই জানে। নীরা মায়ের মানসিকতা টের পায়। মা যে কেন দু-দণ্ড কোথাও গিয়ে থাকতে পারে না তা মনে করে দুঃখ পায়। দাদার জন্য তার একটা অনুশোচনা থেকে যায়।

বনশ্রীনগর থেকে জয়ন্ত মাঝে মাঝে আসে। সরমাকে কলকাতায় ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে যায়। সরমার পাগলপনা এখনও সারেনি। ডাক্তার দেখানোর টাকাটা বাণী দেয়। জয়ন্ত নিতে চায়নি; কিন্তু অভাব যার সঙ্গী, তার জেদ কতক্ষণই বা টিকে থাকে, তাছাড়া বাণীর ব্যবহারে না করার মতো ক্ষমতা জয়ন্তের থাকে না।

সরমা সতীনকে কোনদিন চোখে দেখেনি। বাণীও সে পরিচয় দিতে চায়নি। জয়ন্তের কোন এক বন্ধুর মায়ের পরিচয় দিয়ে এ বাড়িতে রেখে তার চিকিৎসা চলছিল। মিথ্যার আশ্রয়ে একটা সুবিধা ছিল। এখানে তুহিন কিংবা নীরা কারও উপস্থিতি ছিল না।

বাণী সরমাকে দিদি বলে সম্বোধন করে। দুজনের খুবই ভাব। বাণীর দিদি কিংবা বোন কেউ ছিল না। সরমাকে পেয়ে তার একাকিত্বের কালো দিনগুলো কিছুটা লঘু হয়ে জীবনের তারে বাঁধা হয়ে গেল। ফলে অন্যমাত্রার

সুর পেল বাণী। নীরবে সে নতুন এক স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল। সরমার প্রতি কর্তব্য করে নিজেকে হালকা করল সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তের প্রতি বিশাল দায়িত্বের কথা অনুভব করে আপ্রাণ চেষ্টা করল জয়ন্তকে নিজের মতো করে বাঁধার।

সরমার পাগলপনা অনেক কমে গেল। যে কটাদিন তার পাগলামি চলে সে কটাদিন বাণী বড় বিচলিত থাকে। সরমার প্রলাপকথা শুনে বাণী বোঝে এক ধরনের পাপবোধ থেকে সরমার এমন উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ওর মন থেকে এই পাপবোধ না মুছলে এর ভালো হওয়া অসম্ভব। বাণী চেষ্টা করে ওর ভিতরের গ্লানির কথা টেনে বার করার। পাগলামির দিনগুলো ভয়ে ভয়ে থাকে বাণী। এই সময় সরমার কোন জ্ঞান থাকে না। ঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে। ভেঙে তছনছ করে। বাণী সামলাতে গেল তাকে দুমাদ্দম দু-চার ঘা বসিয়ে দেয়। আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে। মুখ বুঝে সহ্য করে বাণী। জয়ন্ত থাকলে সুবিধা হয়। সে সরমাকে একটা ঘরে বন্দি করে রাখে।

সরমা এখন অনেক সুস্থ। কথায় কথায় একদিন বাণী তাকে জিজ্ঞাসা করল– দিদি।

কিছু বলবি?

–জয়ন্ত বড় ভাল ছেলে তাই না? ও তোমার খুব যত্ন করে।

–তা করে। অমন ছেলে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

–তুমি অমন ক্ষেপে যাও কেন?

–কি জানি বাপু, আমর কিছু মনে থাকে না।

–তুমি ক্ষেপে গেলে যা সাংঘাতিক কাণ্ড কর না, তা বলার নয়। এই দেখ, গত সপ্তাহে কেমন আঘাত করেছে। সরমা লজ্জা পায়। অনুশোচনায় বলে, অমাকে ক্ষমা করো দিদি। কি যে হয় আমার, আমি নিজেই জানি না। আমার স্বামী–। বলতে গিয়ে আটকে যায়।

তোমার স্বামী?

স্বামীর কথায় আনমনা হয় সরমা। জীবনের গভীর গোপন যন্ত্রণা এতকাল তাড়াকে নিশ্চুপ করে রেখেছে। মনের কথা শোনানো লোক সে পায়নি। এই প্রথম একজন সমমর্মী সমঝদার শ্রোতা পেয়ে তার কাছে সবকিছু উজাড় করে বলতে বলতে ঝরঝর করে কাঁদল সে। হৃদয়বেগে অশ্রুতে বর্ধিত হওয়া কথাগুলোর বেদনা বাণী অনুভব করে অশ্রু মোছাল তার। সরমার বুকে হাত বুলিয়ে বলল– দিদি জীবনের ধারা এই রকম। কোথা দিয়ে কি যে হয় কে জানে। তাকে অত করে ভাবলে চলবে না। অতীত মুছে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরো। সব ভাগ্যে সব সুখ সয় না। কেউ বাল্যে বিধবা হয়ে সারা জীবন বৈধব্যে কাটায়। কেউ সব শোক তাপ বিসর্জন দিয়ে নুতনভাবে বাঁচার পথ খোঁজে। এটা বুঝে, তুমি পার না তোমার দুঃখভার লাঘব করতে। আজ এ বয়সে শোক করে লাভ নেই। যে স্বামী কুড়ি বছর খোঁজও নেয় না, তার জন্য এত দুঃখ কেন? তাকে মৃত বলে ধরে নাও।

সরমা বাণীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, স্বামী সুখ আমি চাই না। তার থাকা না থাকা আমি সয়ে গেছি। ওর কাছে আমার এক ছেলে ও মেয়ে তুহিন-নীরা রয়েছে। তুহিন অনেক বড় হয়ে গেছে। ও আমার কাছে গিয়েছিল, আমার ভালোর জন্য বাপের উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু যখন বুঝলাম ও আমার কাছে মা বলে যায়নি, গিয়েছিল নিজের কৌতূহল মেটাতে। তখন তাকে সত্যটা জানিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমার গোপন পাপ কথা সে সহ্য করতে পারেনি। ও চলে গেল। তারপর থেকে তার কোন খোঁজ পাইনি। এই শহরেই থাকে। এত বড় শহরে কোথায় তাকে কি করে খুঁজব!

তুহিনের প্রসঙ্গে বাণী ডুকরে কাঁদে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, সত্যি অতবড় ছেলে কোথায় যে গেল, কে জানে?

–কোথায় আবার যাবে। ওই দিবাকর আর আমার সতীন তাকে আটকে রেখেছে।

–না। চিৎকার করে কাঁদে বাণী।

–কী হল! আমার জন্য তোর এত শোক কেন বোন? তুহিনকে তুই চিনিস নাকি? বল না, এই শহরে কোথায় থাকে তারা, একবার শুধু দেখব তাদের।

–তোমার দুঃখ সহ্য করতে পারিনি দিদি, তাই কাঁদছি। এই এতবড় শহরে তুহিনকে কোথায় খুঁজব, তবে আমার বিশ্বাস ও একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে।

সরমা হাসল। বাণীর বিশ্বাসের তারিফ করে বলে রান্না করবি নে? জয়ন্ত এসে যাবে, ও এলে দুপুরে বেরিয়ে পড়ব, সুষমার জন্য মন কেমন করছে এই আশ্বিনে ওর বাচ্চা হবার কথা।

–তাই, এ তো সুখবর। তুমি ভাগ্যবতী দিদি, নেই নেই করে তবুও তোমার কেমন সব পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে, আর আমার পূর্ণ সব শূন্য হয়ে গেছে।

সরমার আত্মতৃপ্তির মুখ দেখে সুখ পেল বাণী। সে সজল চোখে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল– একদিন সুষমাকে দেখতে যাবো।

–আজই চল না আমাদের সঙ্গে।

–আজ? আমার যে অনেক কাজ। একজনের জন্য যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। আমি না থাকলে যদি সে ফিরে যায়, তাই; দু'দণ্ড কোথাও গিয়ে থাকতে পারিনে।

বাণীর কথায় সরমার রোমাঞ্চ জাগে। সরমা জানে, কার জন্য বাণীর এ অনন্ত প্রতীক্ষা। মুখে কিছু না বলে তার যন্ত্রণা অনুভব করল সে। যার ভাবনাতে সে এত কাতর, যার প্রত্যাগমনের আশায় এক রাত্রি বাইরে থাকতে পারে না, যার অদর্শনে ছন্দোময় জীবনে ছন্দহীনতার তাপ, সে যে তুহিন, তা বুঝতে সরমার বাকি থাকে না।

আসলে, মানুষের জানার প্রবৃত্তি জন্মগত অসুখ। মানুষ যেখানে থাকে সেখানকার সম্পর্কে সে ধীরে ধীরে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সরমা এ বাড়িতে আছে মাসতিনেকের ওপর, এর মধ্যে এ বাড়ির সম্পর্কে অনেক জানা হয়ে গেছে। বাণীর স্বামী মারা গেছে। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছেলে ছিল, বাইরে কোথাও থাকে। আপাতত বাণী ও বাড়িতে একা। ভালো থাকা অবস্থায় সরমা একদিন জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করেছিল, কলকাতায় তোর বন্ধু হল কি করে? জয়ন্ত কোন সদুত্তর দেয়নি, বলেছিল, যে ডাক্তারকে দেখাচ্ছি তিনিই থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, তারই পরিচিত কেউ হবে। সরমাও সরল প্রাণে বিশ্বাস করেছিল। এখানে সরমার একবার মাত্র চার-পাঁচ দিনের মত পাগলামো চেপেছিল। সেই সময় জয়ন্ত তাকে তুহিনের পড়ার ঘরটায় থাকার ব্যবস্থা করে। রাতে উঠে কোথাও চলে না যায়, তাই বাইরে থেকে শিকল তুলে রেখছিল। এভাবে থাকতে থাকতে একদিন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তুহিনের পড়ার ঘরে এত বইপত্র দেখতে দেখতে, এটা ওটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আবিষ্কার করেছিল। আলমারির ভিতরে রাখা দিবাকর, বাণী, তুহিন ও নারীর বাঁধানো ছবি। চারজনের মধ্যে নীরাকেই চিনতে পারল না শুধু। ছবিটা বের করে নিয়ে অনেকক্ষণ হু হু করে কেঁদে ছিল, সে বুঝতে পেরেছিল, জয়ন্ত তাকে মিথ্যে বলেছে, যাকে বন্ধুর মা বলে চালাতে চাইছে সে ভদ্রমহিলা তার সতীন বাণী। সবকিছু বুঝতে পেরেও ওদের কাছে প্রকাশ করেনি। বাণীর অমায়িক ব্যবহার, জয়ন্তের প্রতি স্নেহ, তার প্রতি বোনসুলভ আচরণ, তুহিনের প্রতি মমতা, তার জন্য আকুল হওয়া সবই তাকে এত বিহ্বল করেছিল, যে বাণীকে আপনজন বলে মনে হয়েছিল তার।

দিবাকরের মৃত্যু তাকে আঘাত করল। নীরবে কাঁদল একা। তারপর অশ্রু মুছে নিজেকে সংযত করল। সবকিছু না জানার ভান করেই ভালো হয়ে থাকল সে।

জয়ন্ত এল সকাল সাড়ে নটায়। এসেই তাড়া লাগল, তাড়াতাড়ি করো মা, সুষমার শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছিল। ওকে নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। তুমি দিদিমা হতে যাচ্ছ।

সরমা আনন্দ করে, বাণী সেই আনন্দের অংশীদার হয়। সরমা বাণীকে চেপে ধরে– এই সুযোগে তুমিও চল না দেশের বাড়িতে।

বাণী এড়িয়ে যায়– এখন নয় মেয়েজামাই এলে ওদের সঙ্গে যাবো। জয়ন্ত তো আসবে। বাড়িশূন্য করে কোথাও গিয়ে একবেলা থাকতে পারবো না। গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসাটা কি ঠিক হবে? তুমিই বলো।

সরমা হাসল। বাণীর মুখের দিকে চেয়ে গভীর শ্বাস ফেলে ভাবল, তুহিনের জন্য তোমার কোথাও শান্তি নেই বোন। ভাত খেতে খেতে বাণীই সরমাকে বলল– এবার জয়ন্তের বিয়ে দাও দিদি; তুমিও শান্তি পাবে।

বিয়ের প্রসঙ্গে জয়ন্ত আপত্তি করে ওঠে– না মা এখন ওসব চিন্তা করো না, আরও বিঘে দুই জমি কিনি, সামনের বর্ষার।

আগে ট্রাক্টর কিনব; ঘরবাড়ি তৈরী করতে হবে। বৌ এসে থাকবে কোথায় শুনি? তাছাড়া তুমিও ভালো হয়ে যাবে। তারপর ভাবা যাবে।

বাণী জয়ন্তের আনন্দমুখ দেখে বলল– ও সবই হয়ে যাবে।

সরমা বাণীর কথায় সায় দিল। বলল– আমিও ভাবছি তেমন সুলক্ষণা পাত্রী পেলেই সামনের ফাল্গুনে বিয়ে দিয়ে দেব।

–কোথাও পাত্রী দেখছ? বাণী শুধাল।

–না, আমার কী দরকার। তাছাড়া পাগল-টাগল মানুষ ওসব বুঝি না, তুমিই ওর জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, সুলক্ষণা পাত্রী খোঁজ বোন।

–আমি! অবাক হয় বাণী।

–কেন বোন, তুমি এই মাসতিনেক ওর জন্য যা করেছ, তা তো সারা জীবনে শোধ করতে পারবে না। কৃতজ্ঞতা দিয়ে সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। ভালোবাসার শিকড় চারিয়ে সম্পর্ককে ধরে রাখতে হয় জন্মের মতো। এই সামান্য অধিকার গ্রহণ করে ওকে তোমার আঁচলে বেঁধে নাও।

সরমার মিষ্টি কথায় বাণী হাসল। বলল, পৃথিবী বড় সুন্দর দিদি জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যবর্তী জীবন ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে যতই বর্ণহীন হোক না কেন ভালোবার গন্ধ পেলে সবুজ পাতার মতো জীবন ঠিকই কুঁড়ি মেলে। সবুজাভ হয়ে রৌদ্রকিরণে নিজের অস্তিব জানান দেয়। তুমি সেই শিকড়ের টান অনুভব করেছিলে বলেই আজ তার ঘ্রাণ পাচ্ছ। জয়ন্ত যে শিকড় ছড়িয়ে গেছে কোন জন্মেও ওকে ভুলতে পারব না।

দেরী হচ্ছে দেখে জয়ন্ত তাড়া দিল– তাড়াতাড়ি করো মা, ওখানে পৌঁছতে হবে।

–হ্যাঁ, চলো।

গোছগাছ শুরু করল জয়ন্ত। বাণী সরমার ওষুধ, খাবার নিয়মাবলী, আবার কবে আসতে হবে, কীভাবে সাবধানে রাখতে হবে ইত্যাদি যাবতীয় টুকিটাকি কথা জয়ন্তকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সরমা ঢুকল তুহিনের ঘরে, কাপড় পরতে।

গোছগাছ করে জয়ন্ত বসল সোফায়, বাণী পাশে বসল। জয়ন্তকে তার ছাড়তে ইচ্ছে, করছিল না। তাদের সম্পর্ক সরমা যেন জানতে না পারে তার জন্য সাবধান করল। জানলে উত্তেজনায় আবার হয়ত পাগলামো শুরু হবে। জয়ন্ত অভয় দিল। বাণী অনুভব করল, একাকিত্ব আবার তাকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে।

–আবার কবে আসবি? ট্রাক্টর কেনার কী হল?

–মা সেরে উঠলে কিনব।

–কেনার সময় অসুবিধা হলে আমাকে জানাবি।

সরমার বেরুতে দেরী হচ্ছে দেখে জয়ন্ত চেঁচিয়ে ডাকল– মা তাড়াতাড়ি করো।

কয়েক মিনিট পরে দরজা খুলে যিনি বেরুলেন, তাকে দেখে জয়ন্ত বাণী অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। জয়ন্ত

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে। বাণী স্তব্ধ, বিমূঢ়, পাথরের ভাষা নিয়ে বসে থাকল সোফায়।

সাদা ধবধবে থানে মোড়া সরমা। হাতের শাঁখা নেই। সিঁথির সিন্দুর মুছে ফেলেছে। বিধবার পোশাকে সরমা বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বাণীর সামনে। বলল, মুখ তোল বোন, আসল সত্য কতদিন চাপা দিয়ে রাখবি।

–দিদি! বলে বাণী সরমাকে প্রণাম করতে গেলে, সরমা তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, আমার বুকে আয় বোন। তোর মতন বোন থাকলে আমার পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

জয়ন্ত বিহ্বল হয়ে দুই নারীর শোকার্ত বেদনা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

চক্রধরপরা শহরতলীর এক নির্জন স্টেশন। সকাল দশটায় আগে শহরের অফিস যাত্রীরা দল বেঁধে শহরে যায়, বিকেলে কিংবা রাতে ফেরে। দূরপাল্লার কোন ট্রেন এখানে থামে না। লোকালগুলো যায় আসে।

এই স্টেশনের প্লাটফরমের এক কোনে শুয়ে রয়েছে তুহিন। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। কথা বলার শক্তি নেই। তাকে সামনে রেখে একদিন ভিখারিণী হাত পেতে ভিক্ষা চাইছে, বাবুগো দুটো টাকা দেবেন, ছেলেটার খুব জ্বর।

একজন ল্যাংড়া ভিখারি বসেছিল তুহিনের পাশে। সে মাঝে মাঝে ঝুঁকে দেখছিল তুহিনকে। ছেলেটার চোখ মুখে কেমন যেন লাললাল ভাব। গায়ে ছোট ছোট দানার মতো কি সব বেরিয়েছে। সে আরও কয়েকবার ভালো করে দেখে ভিখারিণীর কানের কাছে মুখ রেখে ফিস ফিস করে কি যেন বলল। ভিখারিণী ভিক্ষা চাওয়া বন্ধ করে ঝুঁকে দেখল তুহিনকে। নিচু স্বরে বলল, গায়ে কি বেরিয়েছে?

–'মায়ের দয়া'

–সে আবার কি?

–তাও জান না, রাম রাম এই ভর সন্ধ্যায় মুখে আনব!

–বল না

–জলবসন্ত।

এ্যাঁ, বলিস কি রে! তবে তো ওকে ছোঁয়াও যাবে না। মহাবিপদ।

–একে এভাবে বয়ে বেড়াব না কি?

–পাগল হয়েছিস।

–তবে কি হবে

–চল একে রেখে আমরা পালাই।

–কিন্তু এর কি হবে।

–পড়ে থাক। মরুক বাযুক আমাদের কি? কোথাকারকে তার জন্য এত দরদ কিসের। আর জানাজানি হলে হাসপাতাল ছোট। পরিচয় দাও। সে আর এক কেলেংকারি। আরও বিপদে পড়া।

–কেন?

–মরে গেল থানা-পুলিশ। অসুস্থ ছেলে দেখিয়ে দুদিনে প্রায় হাজার টাকা কামিয়েছে। পাবলিক জানলে পেদিয়ে বাপের বে দেখিয়ে দেব। তার চেয়ে বাবা আস্তে আস্তে কেটে পড়।

বলতে বলতে হাতের ঝোলা, লোটা, কম্বল গোছাতে থাকে ল্যাংড়া। আজকে যা পেয়েছে তা ট্যাকে গুজতে গিয়ে কি ভেবে কয়েকটা দু-টাকার নোট তুহিনের ট্যাঁকে গুজে দেয়, থাক, ঘুম ভাঙলে খিদে পেলে খাবে।

তুহিনের সামান্যতম বোধ ছিল। উঠার শক্তি ছিল না। সে ওদের চাপাস্বরে কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিল। তীব্র যন্ত্রণায় অস্পষ্ট স্বরে ডাকছিল মা ও মা।

তুহিনের যন্ত্রণা স্পর্শ করল ভিখরিণী। সে ঝুঁকে তুহিনের স্বর বোঝার জন্য কানের কাছে মুখ রেখে তার কথা বোঝার চেষ্টা করতে সঙ্গে সঙ্গে ভিখারি সতর্ক করে, এ্যাই ছোঁসনা ভিকারিণী ছুঁল না তুহিনকে। চারদিক সতর্ক দৃষ্টি ফেলে কম্বল নিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটা ট্রেন আসছে। ওই ট্রেনেই ফিরে যাবে তারা।

দু-চার পা এগিয়ে কি মনে হতেই আবার ফিরে এল ভিখারিণী। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে একটা ছেড়া কম্বল তুহিনের গায়ে চাপিয়ে দুা দুা বলে প্রায় ছুটে গেল ট্রেনের দিকে।

ট্রেন আসতেই প্রায় লাফিয়ে উঠল দু'জনে। একবার ফিরেও চাইল না।

এই চক্রধরপুর স্টেশনের ইনচার্জ মণিশংকর চক্রবর্তী মাঝে মাঝে বুকিং কাউন্টারের সামনে বসেন। গতকাল বিকেলে ক্রাচে ভর দিয়ে ভিখারি এবং ভিখারিণীকে নামতে দেখেছেন। ছেলেটিকে কয়েকজন ধরে প্লাটফরমে নামিয়ে দিল। গতকাল সারা বিকেল এবং আজকের সারাদিন ওই ছেলেটি সামনে রেখে ভিক্ষা করতে দেখেছেন। এত দেখার মধ্যে নতুন কিছু মনে হয়নি তার। এতো নিত্যঘটনা। কত ভিখিরী, চোর-বদমাশ, পকেটমার প্লাটফরমে রাত্রি বাস করে। কিন্তু অসুস্থ ছেলেকে ফেলে এভাবে পালানোর পিছনে কিসের যেন গন্ধ পেলেন তিনি। কৌতূহল বশতঃ ছেলেটির কাছে এসে দেখলেন, ছেলেটি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। চোখমুখ বেশ লাল। মশার কামড় বা অন্য কিছুতে মুখে দানা দানা কিসব বেরিয়েছে। ছেলেটিকে দেখে মনে হল এ ভিখিরীর ছেলে নয়। সুদর্শন, টুকটুকে ফর্সা। দেখেতো লাগছে কোন অভিজাত বাড়ীর ছেলে। তবে কি কোন বাটপার নেশার কিছু খাইয়ে ছেলেটির সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে গেল। আজকাল তো হামেশাই হচ্ছে। প্রথম আলাপ করে বন্ধুর মতো মেশে, তার চায়ের সঙ্গে বা বিস্কুটের সঙ্গে নেশার দ্রব্য খাইয়ে সবকিছু লুট করে নেয়। এরকম ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের মাথা কাটা যাচ্ছে।

মনিশংকর বাবু তার সহকর্মী দয়াল বাবুকে ডাকলেন। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। মনিশংকর বাবু তুহিনকে পরীক্ষা করে বললেন, মনে হচ্ছে খুবই অসুস্থ। এখুনি ডাক্তার খানায় পাঠানো দরকার। আমাদের রেল হাসপাতালের ডাঃ আশরাফকে ফোন করে এ্যামবুলেন্স পাঠাতে বলুন।

দয়াল বাবু তাড়াতাড়ি ফোন করলেন।

আধাঘন্টার মধ্যে ডাঃ আশরাফ এ্যামবুলেন্স নিয়ে হাজির । তিনি কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, মনে হচ্ছ টাইফয়েড। মনিবাবু নিজে গিয়ে ছেলেটিকে ভর্তি করে এলেন। চারদিন পর জ্ঞান হল তুহিনের। মনিবাবু প্রায় প্রতিদিন দেখা করে এসেছেন। যেদিন যেতে পারেননি সেদিন ফোনে খোঁজখবর নিয়েছেন। ডাঃ আশরাফ তার বন্ধুলোক। অসুবিধে হয়নি।

সেদিন বিকেলে ছেলেটিকে দেখতে গেলে নার্স তুহিনকে উদ্দেশ করে বলল, এই যে ইনি তোমাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

ব্যস্ত হয়ে তুহিন উঠে বসে বিছানায়।

মনিশংকর বারণ করে, না-না শুয়ে থাক।

–কি নাম?

–তুহিন ভট্টাচার্য।

–বাড়ি?

বাড়ির কথায় তুহিন চুপ করে যায়। যেন উদাস। কোন ঠিকানা নেই। যেখানেই সন্ধ্যা নামে সেখানেই রাত্রি যাপন। আবার দিন হলে পথ চলা। বুকের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তাকে অস্বস্তি হতে দেখে, মনিশংকর বাবু বললেন, না থাক আজ আর কথা বলো না, অন্যদিন বলো।

মনিশংকর বাবু বাড়ি ফিরে লিপিকাকে সব বলল। লিপিকা তার একমাত্র মেয়ে। আদরের। মা-হারা। শুনে লিপিকা বাবার প্রতি প্রীত হল। বলল, এতদিনে কাজের কাজ করেছ। তা কোথায় বাড়ি? কিছু বলেছে। না এখনও জানা যায়নি। শুধু নাম জেনেছি। তুহিন ভট্টাচার্য পরদিনই মনিশংকর বাবু লিপিকাকে সঙ্গে করে হাসপাতালে হাজির। উদ্দেশ্য ক'দিন ধরে লিপিকাও জ্বরে ভুগছে। তাকে একবার ডাঃ দেখানো এবং তুহিনকে দেখে আসা। মনিবাবুকে কেবিনে ঢুকতে দেখে তুহিন উঠে দাঁড়ায় এবং প্রণাম করে। জামা কাপড় ছিল না জেনে ওর জন্য প্যান্ট, শার্ট কিনে দিয়েছেন। নতুন শার্ট পরে বসেছে তুহিন। বেশ উজ্জ্বল স্মার্ট দেখাচ্ছে তাকে। লিপিকাকে দেখিয়ে বলল, আমার মেয়ে লিপিকা।

–আমি তুহিন।

–নমস্কার।

–নমস্কার।

সামনের টুলে বসল মনিবাবু। বিছানায় লিপিকা।

তুহিনের দিকে চেয়ে মনিবাবু প্রশ্ন করলেন, তা সঙ্গের ভিখারী ও ভিখারিণী জুটল কি করে?

ওদের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে আলাপ। সব ঘটনা খুলে বলল, তাকে দেখিয়ে নিজের সন্তান বলে পয়সা উপার্জন, ভিক্ষা চাওয়া কোন কিছুই বাদ গেল না। সব শুনে মনিবাবু উষ্মার সঙ্গে বললেন, মানুষের মধ্য থেকে মানবিক বোধটুকু উঠে যাচ্ছে তাই না। যাকে দেখিয়ে উপমা উপার্জন করল, তাকে ফেলে পালিয়ে পালাল। শরীর খারাপ দেখেও আশ্চর্য!

তুহিন বলল না, একেবারে অকৃতজ্ঞও নয়। যাবার সময় ছেঁড়া কম্বল এবং কুড়ি টাকা ও একটা ছেঁড়া শাড়ি উপহার দিয়েছে।

তুহিনের কথায় হেসে উঠল তিনজনে।

মনিশংকর বাবু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, তা বাবার বাড়ি কোথায়? বাড়ির প্রসঙ্গ -- তুহিন বলল, কলকাতায়।

–বাড়িতে খবর দিই। তারাতো ভাবছেন।

তুহিন আমতা আমতা করে বলল, আমার কেউ নেই।

–কেন, মা বাবা, আত্মীয়-স্বজন।

–কেউ নেই।

–আহারে!

লিপিকা দুঃখিত গলায় বলল, মা মারা গেছেন? বাবাও?

–না, সবাই বেঁচে আছেন। আমার কাছে সব মৃত। যারা দু'একজন আছেন তাদের কাছে ফেরা না ফেরা দুটোই সমান। তাদের কাছে সারাজীবন না গেলেও কখনও খোঁজ করবে না।

ঝগড়া করে এসেছ বুঝি?

–না, অভিমানে। নিজের দুর্ভোগের প্রতিশোধ নিতে।

বলেই তুহিন চুপ করে গেল।

মনিবাবু বুঝলেন, তুহিন সব কিছু বলতে চাইছে না।

পাশে বসে লিপিকা একক্ষণ তুহিনকে দেখছিল। ওর চোখ মুখের ভাষা বুঝতে পেরে বলল, থাক না বাবা, উনি যখন চাইছেন না, জোর করার কী আছে।

তুহিন মাথা নিচু করল।

লিপিকা তুহিনের মুখ স্পর্শ করল। চোখের বিদ্যুতে স্পর্শ করল দুজনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মনিবাবু বললেন, ছাড়া পেয়ে কোথায় যাবে?

– ভেবে দেখিনি। যেদিকে চোখ যায় যাব। তবে বলতে পারি, বাড়ি ফিরব না।

–বড় মুশকিলে ফেললে হে?

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তুহিন মনিশংকর বাবুর হাত ধরে বলে, আপনার ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়, তবুও একটা অনুরোধ করব?

–বলো।

–আমি কেমিস্ট্রি অনার্সের ছাত্র। আমার কোথাও একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিলে আমি দু-চার ছাত্র পড়িয়েও ঠিক চালিয়ে নেব।

–দেখি কি করা যায়।

মনিবাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তুমি যখন নিজের কথা বলতে চাইছনা, তবে জোর করব না। তবুও বলি মা-বাবার উপর রাগ করে ঘর ছাড়তে নেই। জীবনে অনেক ঘটনা-ই ঘটে যা অসহ্য, তবুও সব মানিয়ে চলতে হয়।

–আপনার কথা অমান্য করছি না। তবুও এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা মনটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। যার কোন তল থাকে না। তখন মনে হয় আত্মহত্যাই শ্রেয়। কিন্তু মৃত্যু এত সহজ নয়। মানুষ বেঁচেও মরে থাকে।

–ছিঃ। আত্মহত্যার কথা মুখেও এন না।

তুহিন থামে। তাকে দেখে মনে হল ভিতরে ভিতরে পুড়ে যাচ্ছে। সে নিবু স্বরে বলে, আচ্ছা মেসোমশাই মানুষ কী বংশ মর্যাদা ছাড়া বাঁচতে পারে না।

– কেন পারবে না। মনুষ্যত্বই তো মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

–আমি ওই পরিচয়ে বাঁচতে চাই। একবার সুযোগ দিন আমায়। মনিবাবু বিচলিত। বসে বসে ভাবেন। লিপিকাও তুহিনের কথায় চমকায়।

পথে নেমে মনিবাবু লিপিকাকে শুধায়– তুহিন ছেলেটা কেমন যেন, তাই না?

–না, ভালই। নিজেকে খুব চালাক মনে করে। তবে কথাবার্তা চাল-চলন ভদ্রতা দেখে মনে হয় ছেলেটি ভালই। এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

মনিশংকর বাবু মনে মনে বলেন, আবার কেমেস্ট্রিতে অনার্স। ওকে যদি লিপিকার টিউটর হিসাবে ঘরে রাখা যায় তবে খুব ভালই হবে। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে একজন সর্বক্ষণের টিউটর পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাছাড়া লিপিকার সঙ্গে ওকে মানাবে ভাল। বাইরে ঘরটা এমনি পড়ে আছে। লিপিকার মা মারা যাবার পর ঘরটাকে ব্যবহার করাই হয়নি। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিলেই হবে। কিন্তু এত বড় একটা পদক্ষেপ নেবার আগে স্ত্রী সুরঞ্জনা এবং লিপিকার মতামত নেওয়া দরকার। সুরঞ্জনা মনিশংকর বাবুর দ্বিতীয় পক্ষ।

সুরঞ্জনার কথা মনে হতেই চিন্তাটা মাথায় সরে গেল। ফুটো পাইপ থেকে যেমন ধীরে ধীরে জল নামে তেমনি। যেমনি যাঁহাবাজ, তেমনি মুখরা সব সময় ফুলপরী হয়ে ঘোরে। বাপ-মা জোর করে বিয়ে দিয়েছে বলে যেন মনে শান্তি নেই। সব সময় মা-মরা মেয়েটার পিছনে লেগেই আছে। কথাটা লিপিকাকে জিজ্ঞেস করবে কি না ভাবল। মনে হওয়া মাত্রই বলেই দেখিনা, কি বলে।

চলতে চলতে মেয়ের দিকে চেয়ে বলল, কি করা যায় বলতো।

–কিসের?

–ওই ছেলেটার।

–ডাক্তার বাবুকে বলে দেখ না। উনি যদি কিছু করে দেন।

-তা বলে দেখব।

–কিন্তু আমি ভাবছিলাম।

–কি ভাবছিলে বাবা?

–তোর সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা, ভাবছিলাম এই সময়ে যদি তোর সর্বক্ষণের টিউটর পাওয়া যেত তবে ভাল হত বল?

–তাতো হতোই।

–মাসে মাসে চারপাঁচটা শিক্ষক রেখে তোকে পড়াতে পারব না, তাই ভাবছিলাম থাকা খাওয়ার বিনিময়ে যদি একটা টিচার পাওয়া যায়, মন্দ কি? পয়সার কিছুটা সাশ্রয় হয়।

কি বলিস?

–তাতো হয়, কিন্তু

–দ্যাখ, ছেলেটি বিজ্ঞানের ছাত্র। ভাবছিলাম ওকে যদি বাড়িতে রাখি কেমন হয়?

–মনে হয় ভালো হবে, কিন্তু মা কি মেনে নেবে?

–তুই বললে তোর মাকে বলতে পারি।

মনিবাবু আড়চোখে দেখলেন মেয়ের উজ্জ্বল মুখ। আবার বিষণ্নতার ছাপও।

লিপিকার অস্পষ্ট স্বর, জানা নেই, শোনা নেই একেবারে অপরিচিত একজনকে বাড়িতে রাখা কি ঠিক হবে। শেষে বিপদে পড়বে না তো?

–আরে না, সব মানুষ খারাপ হয় না। শুনলি না ছেলেটি কি বলল? বলল সে মানুষ এই পরিচয়ে বেঁচে থাকতে চায়। মানুষ্যত্বই তার কাছে অনেক বড়। মানুষ অনেক বড় না হলে একথা বলতে পারে না।

বাড়ি ফিরে চা খেতে খেতে সুরঞ্জনাকে কথাটা বলল মনিশংকর বাবু। মনির কথা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সুরঞ্জনা। বলেছিল, তোমার কি মাথা খারাপ, ঘরে সোমত্ত মেয়ে, একটা যুবক ছেলেকে রাখা কি ঠিক হবে। কখন কি ঘটিয়ে বসবে তখন কি করবে?

–লিপিকার প্রতি আমার ভরসা আছে। বিশ্বাস করি।

–থামতো ভরসা, বারুদ-আগুন কি এক সাথে থাকে?

–অতসব চিন্তা করনা তো। ছেলে ভালো হলেই অনেক চিন্তা দূর হবে। আজকালকার বাজারে অমন ছেলে পাওয়া ভাগ্যের কথা। ছেলেটি কেমেষ্ট্রিতে অনার্স। তাছাড়া আমাদের খোকারও ক্লাস থ্রি চলছে, ওরও সুবিধে হবে, তুমিও একজন গল্প করার, ফাই-ফর্মাসের লোক পাবে।

শেষে কথা লুফে নিয়ে সুরঞ্জনা বলল, দেখ যা ভাল মনে কর তাই কর।

নতুন আশ্রয় পেল তুহিন।

নিজের অসতর্ক মুহূর্তে কোন মতেই সে সেই আশ্রয় ভাঙতে চাইল না। একটা জীবন থেকে ছিটকে এসে একটা জীবন গড়ার অন্যরকম সুখ অনুভব করল সে। মানুষ সম্পর্কে তার ঘৃণার স্তর কিছুটা লাঘব হয়।

মনিবাবুর স্ত্রী সুরঞ্জনা প্রথম দিন সুদর্শন তুহিনকে দেখে অভিভূত। চোখ মুখের অভিব্যক্তি প্রাণের ভাষা তুহিনের চোখ এড়ায়নি। মাস তিনেক যেতে না যেতেই তার আদর, আপ্যায়ন, কথাবার্তা, হাঁটাচলা, কারণে-অকারণে ঘরের ভিতর ডেকে পাঠানো, এটা-ওটা খেতে দেওয়া, চোখের কটাক্ষ, শরীর আলগা করে রাখা ইত্যাদির আচরণে তুহিন অবৈধ প্রেমের লক্ষণ পেল। সঙ্গে তার নিজের জীবনে, পরিবারের জীবনে ওই অবৈধেয় দহন জ্বালা টের পেল। সে খুব সাবধানে সুরঞ্জনার অবৈধ আকর্ষণ এড়িয়ে যায়। সাবধানে পা ফেলে। যতক্ষণ মনিবাবু কিংবা লিপিকা ঘরে থাকে ততক্ষণ সে ঘরে থাকে। ওরা তারা না থাকলে, চাকরি-বাকরির ধান্দা, কলেজের ক্লাস ইত্যাদির অজুহাত দেখিয়ে রেল-লাইনে গিয়ে বসে থাকে। কিংবা দূরে কোথাও চলে যায়।

জীবন একই ছন্দে প্রবাহিত হয় না। নদীর মতো বাঁক নেয়। বাঁক নিতে নিতে নতুন পথের সন্ধান করে।

মনিশংকর বাবু তথা মনিবাবুর সংসারে অতিথি হয়ে এসে একটা আদর্শ মানুষের সন্ধান পেল। লিপিকাকে পড়াতে পড়াতে তার মাধুর্য, লাবণ্যের বিভায় অন্য এক হৃদয়ের গন্ধ পেল সে। বনজ ফুল যেন, সৌরভ ছড়ায় নৈঃশব্দে বাতাসে বাতাসে তার মুখরতা।

পাঁচ বছর কিভাবে অতিক্রান্ত হল বুঝতে পারল না সে। লিপিকা মাধ্যমিকে চার বিষয়ে স্টার পেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। অনেক স্বপ্ন উনাভ জালের মতো জাল বিছিয়েছে মননে, বোধে, হৃদয়ের তারে তারে। নতুন রোদ্দুরের ঘ্রাণে তারা ডানা মেলতে চাইছে। মাঝে মাঝে বিষণ্ন হয় তুহিন। শ্যামার প্রতিচ্ছবি তাকে ভাবায়। কাঁপায়। সে নিজেকে আত্মবিশ্লেষন করে বদলায়, ভাবে পৃথিবীতে এত চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে বাঁচা যায় না। কখনও না। নিজেকে দু'হাতে ওই অন্ধকার সরিয়ে তৈরী করতে হবে চলার পথ।

লিপিকার হাত নিবিড় করে ধরে ছিল তুহিন।

লিপিকা তাকে আকর্ষণ করে বলল, 'কি হলো কথা বলছ না যে।'

–কি বলব?

– আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো তুহিন।

– তা হয়না লিপিকা

–কেন হয় না?

দ্যাখো এভাবে চোরের মতো যাবার কি আছে? যেতে যদি হয় সম্মানের সঙ্গে যেতে হবে। যিনি আমাকে জীবন দিয়েছেন। মান সম্মান আশ্রয়, পুত্র-স্নেহ, মুখে দু-মঠো অন্ন দিয়েছেন সর্বোপরি আমাকে বাঁচার আলো দিয়েছেন তাকে দুঃখ দিয়ে সংসার?

এ-আমি ভাবতে পারি না।

এ আদর্শে তুমি থাকলে তোমার লিপিকা হারিয়ে যাবে।

না, অমন করে বলোনা। জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছি, আর নতুন করে কিছু হারাতে চাইনে। তোমাদের সান্নিধ্যে আমি আবার নতুন করে শিকড় চারাতে পেরেছি। আমি যে এখন বৃক্ষ হবার স্বপ্ন দেখি লিপি।

শিকড় চারালে হবে? তাকে সংরক্ষণ করতে হবে যে। তা নাহলে পোকায় কাটবে যে।

আমার শিকড়ের প্রতি বিশ্বাস আছে।

হু, ঘূণ পোকা যখন সব কেটে তছনছ করে দেবে, তখন কোথায় থাকবে তোমার ওই বিশ্বাস। তাই বলছি সময় থাকতে সতর্ক না হলে তোমার লিপিকা একদিন মরবে।

না, তুহিন প্রায় আর্তনাদ করে উঠে।

লিপিকা তুহিনের দুঃখ ছুঁয়ে বলে, তুমি এত ভয় পাও কেন বলত! চাকরি করছ। রেলের পদস্থ অফিসার। ভালো মাইনে পাও। সংসার বাঁধতে তোমার অসুবিধা কিসে? দু'জনের সংসার ঠিক চলে যাবে। তোমার যেমন পিছুটান নেই আমারও তেমনি।

তুহিন চুপ থেকে লিপিকার কথা শোনে। লিপিকা সামনের প্রসারিত রেল লাইনের দিকে চোখ রেখে বলে, তুমি সারাজীবন চক্রধরপুর স্টেশনে পড়ে থাকবে– এ আমি চাইনে, আর যদি স্টেশন মাষ্টারের ঘর-জামাই হয়ে থাকার বাসনা করে থাক তবে শুনে রাখ এ আমি হতে দেব না। মরে গেলেও এখানে থাকতে দেব না। তুমি আমার নতুন মাকে কতটুকু চেন?

তুহিন মনে মনে ভাবে, 'ভালো করেই চিনি'। আসলে আমার অবজ্ঞা ওকে আরও জেদী করে তুলছে। লিপিকা আমাকে তোমার থেকে দূরে রাখার জন্য এমন আচরণ করছে। অত্যাচার করছে।

তুহিন আঁচ করে লিপিকা কিছু যেন লুকোচ্ছে। সে লিপিকার মুখ থেকে সত্য জানার জন্য বলে, 'মাসিমা কি বলেছেন?'

–কি বলেছে দেখবে? বলেই পিঠের কাপড় এক ঝটকায় সরিয়ে পিঠময় কালসিটে দাগ দেখাল। বলল, দেখ, তোমার মাসিমা কেমন সৎ মায়ের পরিচয় দিয়েছে।

দাগ দেখে কষ্ট পেল তুহিন।

–কেন এভাবে আঘাত করল?

–তোমাকে চাই বলে!

–কেন উনি কি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি হবেন না?

–না। মা চান তার কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হোক। তার বৌ-মারা গেছে না ভেগেছে কে জানে! একটা ছেলেও আছে। সে ছেলের সৎ মা পরিচয়ে যেতে হবে, এ আমি চাইনে।

–কিন্তু মাসিমাতো আমার সঙ্গে তেমন কোন খারাপ আচরণ করেন না।

–ওকে কতটুকু জানো তুমি। এ বাড়িতে রয়েছ মাত্র পাঁচ বছর। দশ বছর বয়সে মা মারা যান। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাবা আবার বিয়ে করেন। প্রথম দুটা বছর কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু মায়ের পেটে বাচ্চা আসার পর আমার ওপর অত্যাচার শুরু হয়। আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না। যখন তখন মারে। খেতে দিতনা। মা পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকত। আমাকে কাপড় কাঁচা থেকে শুরু করে রান্না করা বাসন মাজা ঘর মোছা সবই করাত। বাবা সব সময় বাড়ি থাকত না। তিনি এসবের কিছু টের পেত না।

–তুমি বাবাকে বলনি।

–কোন লাভ হয়নি। বেশি বয়সে বিয়ে বলে বাবা যেন নতুন মাকে যমের মতো ভয় করে। সৎমার কাছে বেশি কিছু পাব না জেনে মুখ বুঁজে সব সহ্য করেছি। লেখা-পড়া ডকে উঠেছিল, তুমি না এলে মাধ্যমিক পাস অধরাই থাকত।

লিপিকার মুখে সৎমার অত্যাচার শুনে তুহিনের চোখের সামনে বারবার বানী-মার মুখ মনে পড়ে। সেই উজ্জ্বল স্নেহময় মুখ। কী মায়াময়, চাঁদিনীর পরশ। তার বুকের ভিতর এক অনন্য স্পর্শ দেয়। সে মুখ তোলে, ভাবে। দুই-নারী। বিপরীত সত্তা। একজন তার সৎ ছেলের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতে কসুর করেনি। অন্যজন এভাবে অত্যাচার করছে। আদর্শ, অনাদর্শ। বিপরীত দুই পরস্পর বিরোধী শব্দ তাকে সম্মোহিত করল। সে এক অনুভবের ভিতরে দাঁড়াল শ্যাম বাজার ফ্লাটের দরজায়। একটা চিত্র দেখল, অবিকল সেই রকম। বাণী মা বসে আছে আজও তার প্রতীক্ষায়। তার বুকের ভিতর হুহু করে উঠে। কি জানি কেমন আছে ওরা। জয়ন্ত, সুষমার অতি সাধারণ মুখগুলো মনে হল অসাধারণ আলো। সেভাবে, যে যেখানেই থাক, বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছুকে পরিহার করতে হয়। আবার কদর্য যদি; সুন্দর হয়ে ওঠে তাকে বুকে নিতে হয়। সংসারে মা নিয়ে চলার নামই বন্ধন। সে সেই বন্ধন দৃঢ় করতে পারেনি বলে সে আজ এত দূরে, ভালোবাসাহীনতায়,

সম্পর্কহীনতায় এক শূন্য মানুষ।

জীবনকে আঁকড়ে থেকে বেঁচে থাকার নামই পথ চলা। তাকে যেতে হবে অনেক দূরের সেই পথ। সেই মুহূর্তে তার বাবার মুখ মনে পড়ল। কি অসহায়ভাবে একজন মানুষ জীবন কাটিয়েছে। সে যদি আজ বাবার জায়গায় দাঁড়াতো তবে সে কি করত। পারত সব অন্যায় মুখ বুঁজে সহ্য করতে? পারত না। বহুদিন পর তার বাবার জন্য হৃদয়ের কোণে এক তিল পরিমাণ অনুশোচনা উপলব্ধি করে। তাতেই তার শরীর ঝিম ঝিম করে উঠে। বড়ো একলা হয়ে যায় সে।

তুহিনকে চুপ থাকতে দেখে লিপিকা বলে, কি হল কথা বলছ না যে।

লিপিকার কথায় ঘোর কাটে তুহিনের, বলে, না ভাবছি তোমার বাবার কথা। তোমার বাবার মতো ভালো মানুষ ক'জন আছেন। ভিতরে ভিতরে তিনিও কত অসহায়।

–তুমি বাবার কাছে যাও। ওই ট্রেন আসছে। আমি যাই। কলেজের দেরী হয়ে যাবে।

ট্রেন আসতে উঠে পড়ল লিপিকা।

ট্রেন চলে যেতে একটা শূন্যতা অনুভব করল তুহিন। সে ওভারব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। লিপিকাও ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখল, জনারণে হারিয়ে যাচ্ছে তুহিন। সে দৃষ্টি ফেরাল। ইলেকট্রিকের সুরু তারগুলে টান টান করে বাঁধা। কত পাক কত খুঁটি কত অবলম্বন। যতদূর দেখা যায় ঢেউ খেলানো রাস্তা, ছোট্ট পাহাড়, জঙ্গল কেটে কেটে রাস্তা। সে দেখল দূর থেকে ধেয়ে আসা ট্রেন কী তীব্র বেগে ছুটে আসছে তার দিকে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘরবাড়ি, রেল কোয়ার্টার্স, আকাশ প্রান্তর শেষ নেই। শেষ নেই। কোথাও সমাপ্তির চিহ্ন নেই। মাথার উপর নীলাকাশ সামিয়ানার মতো হাওয়ার বেগে ফুটে উঠছে।

ব্রীজের উপর দিয়ে মনিবাবুর অফিস ঘর দেখতে পেল তুহিন। ঘাড় গুঁজে একমনে কাজ করছেন মনিবাবু। একটা ট্রেন স্টেশন ছাড়িয়ে চলে যেতে সেদিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তুহিন। পৃথিবীর কোথাও কিছু থেমে নেই। সবাই ছুটছে, জীবনের উৎস মুখে, নবীন উন্মেষে।

সিঁড়ি ভেঙ্গে টিকেট কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতেই মনিবাবু তুহিনকে দেখতে পেয়ে অফিসের ভিতরে ডেকে নিয়ে বলল, কি ব্যাপার লিপি মা আসেনি?

–এসেছিল, ওতো কলেজ গেল।

–ক্লাস শুরু হয়েছে।

–হ্যাঁ।

–তুমি আছ বলে বড় ভরসা পাই বাবা। তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। মনে হয় আমি যেন আমার ছেলের হাতে সব অর্পণ করেছি।

–একটা কথা ছিল মেসোমশাই।

–বলো।

–লিপিকা বলছিল?

–কি বলছিল?

মাসিমা ওকে মারধর করে। কোন আত্মীয় দোজবরের সঙ্গে নাকি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করেছে?

–হ্যাঁ।

–আপনি জেনেও এর প্রতিবাদ করেন না।

–প্রতিবাদে করিনি অশান্তির ভয়ে।

–তা বলে অতবড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা উচিত হয়নি। মনের দুঃখে যদি কিছু করে বসে।

তুমি থাকতে আমার সে ভয় হয়নি। ভাবনা আনমানি। আমার বিশ্বাস তুমি তাকে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখবে।

'বিশ্বাস' শব্দটি তাকে আঘাত করে। এই রকমই তার বাবা বিশ্বাস করেছিল সুরেশ কাকুকে। বিশ্বাস করে সব ছেড়ে আত্ম-তৃপ্তিতে বসেছিল। আর সুরেশ কাকু তার সেই বিশ্বাসের মূল্য দিয়েছে তিলে তিলে। যেমন মণিবাবু বিশ্বাস করেন তার স্ত্রী সুরঞ্জনাকে লিপিকাকে। সেই সুরঞ্জনা তার সীমা রেখা ডিঙিয়ে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। পরপুরুষে তৃপ্তি পেতে চায়।

এতদূর এসেও জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনায় নিজেকে ফিরে পাচ্ছিল তুহিন। জীবন চক্রের আবেগ ধারা কোথাও কোনভাবে মরে না। পৃথিবীর সর্বত্র-ই নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের ভিতর কোথাও প্রচ্ছন্ন ফাঁক থাকে। সে ফাঁক কোথাও মারাত্মক আকার ধারণ করে। কোথাও ভালোবাসায়, প্রেমের সেতু বন্ধন করে। তুহিন বনশ্রীনগরে যে কদর্য, অসহ্য জীবন দেখেছিল, এখানেও সেই কদর্য চিত্র দেখল। বাণীমার মমতা, ভালোবাসা এবং বাবা দিবাকরের ভিতর যে ছায়ামণি বাবুর ভিতর সেই ছায়া দেখল সে। ভাবনার বীজগুলো তাকে অন্য এক সম্পর্কে জড়ায়। দূরের স্বজন যেন ডাকে হাতছানি দেয়, ঘরে ফিরতে বলে। নীড়হারা পাখি খড়কুঠো ঠোঁটে নিয়ে বাসা বানানোর অপেক্ষায় থাকে।

তুহিনকে অন্যমনস্ক দেখে মণিবাবু বলেন, কি হল থামলে কেন, কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেলে কেন? তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো।

–আমি লিপিকাকে গ্রহণ করতে চাই?

–সত্যি বলছ বাবা সত্যি বলছ বাবা! এযে আমার পরম সৌভাগ্য। প্রথম দিন থেকে আমি এই কামনাই করেছিলাম। শুধু তোমার মুখ থেকে কথা শোনার অপেক্ষায় ছিলাম।

–যদি আপনার আপত্তি না থাকে...!

–আপত্তি? তোমার মতো ছেলের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করা যে কোন বাবার গর্ব। কিন্তু আজও তোমার পরিচয় সম্পূর্ণ জানলাম না।

–পরিচয় দিয়ে কি হবে? আমি আপনাদের তুহিন। একজন মানুষ।

–সে মনুষ্যত্বের পরিচয় তুমি রেখেছ তাতে কোন খাদ নেই।

–কিন্তু বাবা হয়ে ভরসা করি কীভাবে। আর পাঁচটা বাবার মতো আমি আমার মেয়ের সুখ চাই। আনন্দ চাই। পরিপূর্ণতা চাই। সংসারের বন্ধন যে বড় মায়ার বাবা, সে বন্ধন না থাকলে সংসার বড় বে-সুরো। শিকড়হীন গাছ যে তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে শুকিয়ে যায়। তাই ভয় করে বাবা।

তুহিন হাসল। পরিতৃপ্তির হাসি, একটু ঝুঁকে মণিবাবুর পা ছুঁয়ে বলল, 'আমি একেবারে ছিন্নমূল নই। আমার একটা পরিচয় আছে। আমার বাবার নাম দিবাকর ভট্টাচার্য। কলকাতায় বড় বইয়ের দোকান রয়েছে। পূর্ণ প্রকাশনী, মা-ভাই বোন নিয়ে বৃহৎ সংসার।'

–এতদিন এসব বলনি কেন? কেনই বা ঘর ছাড়লে।

–সে অভিমান খুবই ব্যক্তিগত। না-ই বা শুনলেন।

মণিবাবু পরিতৃপ্ত হন, বলেন আর কোন সংশয় নেই। সুরঞ্জনা যাই বলুক আজ থেকে লিপিকার সমস্ত দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। তুমি যেদিন বলবে বিয়ের ব্যবস্থা করব।

–আমি কোন অনুষ্ঠানে যেতে চাই না। কোন দান সামগ্রী আমার চাইনে। শুধু রেজিস্ট্রির দিন ঠিক করে এ জীবন বাঁধতে চাই। আপনার আশীর্বাদ আমার পাথেয়।

মণিবাবু তুহিনকে বুকে জড়িয়ে বললেন, আমার বুকভরা আশীর্বাদ রইল বাবা, তোমরা সুখী হও। মণিবাবুর

অফিস থেকে বেরিয়ে সে অনেক দূরে হেঁটে গেল একা। ঠিক করল, কলকাতায় ফিরে যাবে। সে লিপিকার ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল।

বাণী ভালো নেই, একদম ভালো নেই। এক একটা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে শরীর যে টাল খায় তা টের পায় বাণী। আজকাল আগের মত এখানে ওখানে যেতে পারে না। হাঁটতে গেলে শিরায় টান ধরে। দশ মিনিটের পথ সে আধঘন্টায় অতিক্রম করে।

চোখের দৃষ্টি কমতে কমতে এমন হয়েছে খবরের কাগজও ভালো মত পড়তে পারে না সে। সামান্য দূরের কিছু ভালো করে দেখতে পায় না। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করার আগের মতন চিন্তাশক্তিও নেই।

এ ভাঙা সংসারের টুকরোগুলো একসঙ্গে সে জড়ো করে জোড়া দিয়েছে। দিবাকর বেঁচে থেকে যা করতে পারেনি। বাণী কত সহজে তা সমাধান করেছে। ভালো পাত্রী দেখে জয়ন্তের বিয়ে দিয়েছে। সরমা একেবারে ভালো মানুষ। পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতিনি নিয়ে সে বড়ো সুখে রয়েছে। তাদের কথা ভেবে, তাদের দেখে বড়ো সুখ পায় সে।

নীরার আবার বাচ্চা হবে। দার্জিলিং থেকে জামাই ফোন করেছিল, সামনের শরতে নীরাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। এই সময় নীরার খুবই রেস্টের দরকার। খুব সাবধানে থাকতে হবে। বাণী ভেবে পায় না মেয়ে এলে তার দেখাশোনা ঠিকমতো করতে পারবে কি না! চোখে দেখতে পায় না, নিজে ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, সে কী করে এক অসুস্থ মেয়ের দেখাশোনা করবে।

জট পাকানো সুতো খুলতে খুলতে বাণী এতটা পথ হেঁটে এসে আজ এতটাই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, কিছুই করার প্রবণতা নেই তার তবুও সে মৃত্যুকে কেন এত ভয় পায়, জানে না সে। বাঁচার তীব্র ইচ্ছা সে অনুভব করে, যে ইচ্ছা তার বুকের প্রতি গ্রন্থিতে সঞ্চিত আছে। যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছে তার শেষ ইচ্ছাটুকু; ব্যস তুহিনের ছায়াটুকু দেখেই সে মরতে চায়।

বাণীর চোখে ঘুম নেই। আজকাল চোখ বুজলেই তুহিনের ছায়া। তার ক্ষীণ দৃষ্টির সামনে তুহিন যেন আসে। সম্পূর্ণ গোটা একটা মানুষ হয়ে কথা বলে, কাঁদে। বাণী তাকে সান্ত্বনা দেয়। তার মনে পড়ে খুব ছোট থেকে কীভাবে মানুষ করেছে। প্রতি মুহূর্তের শ্বাস-প্রশ্বাস তার বহু কালের চেনা। তার সাইকেলের ঘণ্টি বাজান, কলিংবেলের বোতাম টেপার পদ্ধতি শুনলেও বলে দেবে, তুহিন এসেছে কীনা। জীবনের অধরা মুহূর্তকে সে কী যত্ন করে বুকের রক্তে মিশিয়ে রেখেছে।

আজীবন দুঃখের বেষ্টনী থেকে যাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল, মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তাকে ধরে রাখতে পারেনি বলে দুঃখ উত্তাল হয়ে ওঠে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যায়। তুহিনের চিন্তায় আকুল হয়ে ওঠে বাণী।

পূর্ণ প্রকাশনী বন্ধ। কে চালাবে? সরকারবাবু বয়সের ভারে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। বাণী ভেবে পায় না সে কীভাবে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে!

মাঝে মাঝে ভাবে, ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হলে তার মুখে জল দেবার মত কেউ কাছে থাকবে না। পৃথিবীতে কত কাজ মানুষের। তারা কোন কাজ ফেলে কারও কাছে এসে থাকতে চায় না। জয়ন্ত সংসার নিয়ে এতটাই ব্যস্ত, মাকে চিঠি লিখে কেমন আছে জানার মতো সময় বার করতে পারে না।

মাঝে মাঝে বাড়ির বহুদিনের ঝি বান্টি আক্ষেপ করে, সবাইকে সবকিছু দিলে গা, নিজের জন্য কিছুই রাখলে না। বান্টিই তাকে আগলে রাখে।

কিন্তু তারও সংসার আছে, স্বামী বাচ্চা আছে, সবকিছু ফেলে তো সবসময় তার কাছে বসে থাকা যায় না।

মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে; জাগরণেও স্বপ্ন দেখে, তুহিন ফিরে এসেছে, তাকে মা বলে ডাকছে। সে তুহিন তুহিন করে দরজা খুলে বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা।

পৃথিবীর সুবর্ণ দিন যায়। এক ঝাঁক পাখি আকাশ চিরে তীর বেগে নেমে আসে। আলোর মতন ছুঁয়ে যায়। কখনও চৌকাঠে উড়ে বসে, কখনও জানালায়। কখন তার বুকের ভিতরে ঢুকে যায়।

বাণী তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখতে পায়; একটা নীল ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে স্টেশনে, হাজার হাজার যাত্রীর মধ্যে তুহিন হেঁটে যাচ্ছে। সে এত করে ডাকছে শুনছে পাচ্ছে না। দরজায় শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া করে রাখে সে।

একদিন গভীর রাত্রে দরজায় করিংবেলের শব্দ শুনে বাণী জেগে ওঠে। আর শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্ণ যুবতীর মতো ধড়ফড় করে ওঠে। উঠতে গিয়ে পড়ে যায়। আবার ওঠে, আবার পড়ে যায়, ঘরের আলো জ্বালতে গিয়েও জ্বালতে পারে না। শব্দ শুনেই ক্ষীণ কণ্ঠে বলে ওঠে, কে তুহিন, তুহিন এলি বাবা? দাঁড়া বাবা দাঁড়া আলো জ্বালি।

শুধুমাত্র কলিংবেলের শব্দ শুনেই আগন্তুকের পরিচয় কীভাবে জানতে পারল। দরজায় বাইরে দাঁড়িয়ে নববধূ লিপিকা বিস্মিত হল। তুহিন সলজ্জ হয়ে দরজা খোলার জন্য অপেক্ষায় রইল।

Durer Sojon by Abdur Shukur Khan

suman_ahm@yahoo.com